প্রকাশক :

বিমলেন্দু চক্রবর্তী, বি, এ, সাহিত্যভারতী
প্রতিমা পুস্তক
১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড,
কলিকাতা-১৪।

প্রথম প্রকাশ :

স্নানযাত্রা
১০ই আষাঢ়, ১৩৬১ সন।

বিক্রয় কেন্দ্র :

প্রতিমা পুস্তক
১৩,কলেজ রোড, কলিকাতা-৯।

প্রচ্ছদ পট :

শক্তি বিশ্বাস

মুদ্রক :

অন্নপূর্ণা প্রেস
৩৩-ডি, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৬।

স্বর্গত মা

কণকলতা দেবীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

গ্রন্থের অধিকাংশ গল্প অতি তরুণবয়সের রচনা। আজ থেকে ছ'সাতবছর আগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় মনে রসসৃষ্টির একটি বিশেষ আদর্শ উদ্দাম ছিল। সময়ান্তরে দৃষ্টিভংগীর কিছু হেরফের ঘটলেও নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে গভীর স্নেহবশত গল্পগুলিকে গ্রন্থাকারে রূপ দিলাম।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত দু'একটি গল্প এই গ্রন্থে সংযোজিত হল বৈচিত্র্য-সম্পাদনের জন্য।

সূচি

এই লেখকের অন্যান্য বই :

যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ
যুগমাতা শ্রীসারদামণি
যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ
যুগভগিনী নিবেদিতা
পুণ্যময় ভারত

॥ শবরী ॥

কথা-কাহিনী নয়। ঘটমান জীবনের চিল্‌তে বিবৃতি। খুব সুখপ্রদ না হলেও প্রগল্‌ভতায় লাগাম ধরে রাখতে পারছি না ইচ্ছা-অনিচ্ছায়। তবে বলেই ফেলি আপনাদের, কি বলেন ?

—ধরুন সাল উনিশশো চুয়ান্ন ; মাস ডিসেম্বরের শেষাশেষি। চাকরী হীন আধা-শিক্ষিত বেকার যুবক। শুভানুধ্যায়ীদের অম্লমধুর উপদেশের তাড়নায় এম্প্লয়মেণ্ট এক্‌চেঞ্জ টু ডেয়ারী ফার্ম নাগাৎ একটানা এভাবেই অভিযানের পাট চুকিয়েছি অনেক দিন হলো। অপ্রত্যাশিতভাবেই শেষটায় মিললো একটা চাকরী। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে পেয়ে গেলুম গভর্ণমেণ্ট স্কীমের মাষ্টারী। মাসমাইনা পঞ্চাশ। কর্মস্থল সুন্দরবন অঞ্চল। লোটাকম্বল নিয়ে ছুটলাম ধাঁ ধাঁ করে। ক্যানিং থেকে মাইল দশেক লঞ্চ-জার্নি। তারপর কাদামাটির ঢেউতোলা কাঁচা সড়কে গরুর গাড়ীতে চড়লুম। পেটের তালুতে খিল্ ধরিয়ে নামলুম আমানতপুরে। সেখান থেকে গন্তব্যস্থল আরো মাইল আষ্টেক দক্ষিণ-বাদায়। হণ্টন ভিন্ন গতায়াতের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। বোগলে বোচ্‌কা, হাতে ভাঙাটিনের সুটকেশ আর মাথায় জুতো চাপালাম। ফারাক জমির কাঠ্‌শুকনো খস্‌খসে আলের উপর টেনে টেনে নিয়ে চললুম শরীর-পশুটাকে। তাগদ না থাকলেও তাড়নায় কমজোরী নেই। কাল ভোরেই কাজে নামতে হবে।

এলোকেশী সন্ধ্যার ছুঁইছুঁই অন্ধকারে পৌছলুম গ্রামে—মানে বেগমপুরে। গুটিকয়েক খড়ো ছাউনি আমবাটি আকাশের নীচে ঝিমুচ্ছে নেশাখোরের মতো। গুল্‌তির দুফলা কাঠের মত একটা রাস্তা গেছে ইস্‌কুলঘর মুখো। অন্যটা সাত-পাক ঘুরে নেকা করেছে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার সংগে। নড়বড়ে

সুপুরীর বাতায় ঠেকানো হোগলা-বেড়া টালীচাল ইস্কুল ঘর। জ্যাবজেবে মেটে ভিতে কম্বল বিছিয়ে ধূ ধূ বাদা পেরুনো উত্তুরে দমকা হাওয়ায় বরফচাপা চালানী মাছের মতো কাটালুম সারারাত।

তারপর কখন হঠাৎ কাকডাকা ভোর আসলো গুটিগুটি করে। হোগলার ফাঁক দিয়ে চললো রোদ্দুরের কানামাছি। ঘুম ভাঙলো। পিছনের এঁদো পুকুরে সাঁচি-হেলেঞ্চার জংলা সরিয়ে নিমনোন্‌তো জল মুখে পুরে প্রার্থনা করলুম সূর্যদেবের কাছে: এমন অবস্থা যেন শত্তুরেরও না হয়।

দুদিনেই হাড়ে হাড়ে বুঝলুম সব। চাকুরীর মোহ ঘুচলো। দুরন্ত শীত আর বড় শেয়ালের উপস্থিতিকে হজম করলুম অনেক কষ্টে। কিন্তু মিলমহব্বত হল না কিছুতেই অমন নেই-বুদ্ধি লোকগুলোর সংগে। ছাত্র সর্বসাকুল্যে গণ্ডাপাঁচেক। গেরামে অপগণ্ড ছেলে-ছোকরা যে নেই একেবারে, এমন নয়। কিন্তু নেকাপড়ার কথায় সবাই গররাজী। —লাঙলের ফালে বিদ্যের গুসকুড়ি শানিয়ে কি হবে শুনি? আটপৌড়ের আবার জুতোর শখ! আমার সাঙাতটি তো ভোলা-দিগম্বর। পড়ানোর চেয়ে ছোট্ট কল্‌কেটিকে দু'হাতের ফাঁকে গলিয়ে জগৎকে অসার দেখতেই সে ব্যস্ত। তায় কি কুক্ষণেই যে গলায় পৈতে জড়িয়ে ভট্‌চায্যি বামুন হয়ে এসেছিলুম এখানে! রোজ কম করেও জুটে গেল জনাদশেক—বামুনের পেসাদের আশায়। বাঁশফুল চালের পিণ্ডি ঘোলানো সুবাসে পাঠশালাকে বানিয়ে ফেল্লুম পাকশালা। মাষ্টার থেকে রাঁধুনি! তায় মাসোহারা বন্ধ! মলমাসের দিনগুলো নেইকড়ি হাতে কাটবে কি করে, সেই চিন্তেয় রাতে ঘুম আসে না।

হাল পানি পেলো শেষ নাগাৎ। জুটলো একটা আশ্রয়। প্রাণকেষ্ট হাতির কুঁড়েতে। প্রাণকেষ্ট হাতি! উহুঁ, ভড়কাবেন না। কেষ্ট'র মতো প্রাণ না হলেও গেরামের একজন কেষ্টবিষ্টুতো বটেই। চাষাভূষো কামিন-কামলার মাত্‌বর সে। এই নিয়েই অষ্টপ্রহর জট আর জটলা পাকাতে সে অদ্বিতীয়। যত পরামর্শ সব তার কাছে। আমতলির খাল ঘেঁসে তার ঘর। খড়-কঞ্চি-মাটি-বাঁশের ময়ুরপঙ্খী পালতোলা ঘরটি রয়েছ লুকিয়ে চুরিয়ে। ঘোড়ানিম আর চটকা গাছের আবডালে। আমার জন্যে বরাদ্দ হলো পুবের ভিটের মেটে ছাউনিটি। তালগোলপাকানো তালপাতার চাল, দেওয়ালে পদ্মফুল কাটা পিটুলির বাহার। ঝক্‌ঝকে নিকানো দাওয়ায় সুন্দরী খুটির ঠেস।

ঘরে ঢুকে কম্বলটা বিছিয়ে ফেললুম। দক্ষিণের জানালাটা দিলুম খুলে। বাতাসের ডানায় ভর করে আসা বাতাবী ফুলের মাতাল গন্ধ নিলুম বুক পুরিয়ে। নিবুনিবু রোদ্দুরে সন্ধ্যায় বনপোকা আর ঝিঁঝিঁর একটানা শব্দে কখন চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে এল।

হঠাৎ ঘুমতাড়ুয়া রিণরিণে গলার আওয়াজে ঘুম ভেঙে উঠে বসলুম। ঘরভর্তি একহাটু অন্ধকার। দক্ষিণের বিল থেকে উঠে আসা শালুক-বাদার সোঁদা সোঁদা গন্ধ। পিদিম হাতে ঘরের মাঝখানে এক নারীমূর্তি। অস্পষ্ট আলোর বৃত্তে আধোস্পষ্ট মুখের আদল। দেড়্খো'র উপর বাতিটা রেখে ধপ্ করে বসে পড়লো সে উদোম মাটির উপর। কোজাগরী চোখদুটো বড় বড় করে বল্লে: বলিহারী নিদ্ বাবা! কই গো ঠাকুর, রেতে খেতে হবে না গো। কুটোকাটা দাওয়ায় রেইখে এয়েচি। দুটি ভাতে-ভাত চড়ালেও তো হয়!—

কাঁচা ঘুমভাঙা চোখে রেগে জবাব দিলুম: না, খাবো না আজকে।—তালু নাগাৎ উঁচু করা তালখোঁপার উপর দিয়ে ঘোমটাটা কলাপাতার মতো খাড়া হয়েছিলো। সেটাকে সিঁথি পর্যন্ত টেনে ফিক্ করে হেসে উঠল: সে কেমন ধারার কতা? খাবে না কি গো? বামুন মনিষ্যি! নইলে যা হোক করে দিতেম রেধে নিজেই।—তারপর হঠাৎ হাটুতে ভর করে দাঁড়ালো সে। বল্লে: নে, তুই বোস ঠাকুর। দেইখে আসি কি আছে ঘরে।—হেলেদুলে কড়া হাতে শক্ত নোয়ার ঝুমঝুমি বাজিয়ে চলে গেল সে। তড়িতাহতের মতো নির্জীব নির্বাক হয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইলুম। ফিকে আলোয় সেই কথার রেশ ছন্দ বুনে চলেছে সারা ঘরময়। কখন হঠাৎ ফের সে ঢুকলো ঝড়ের মতো ঘরের ভিতরে। কুনকোধামা মুড়ি আর গোটা কয়েক পানিফল নিয়ে। হুকুমের কসরৎ দেখালো। আর হয়ত কলাপাতা ঘোমটার অন্দরে চটুল চোখদুটো রসিকতার অন্বেষায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো।.......

দুদিনেই অন্তরংগ হয়ে উঠল পদ্মবৌ। গাজনের মেলা, দক্ষিণারায়ের গান থেকে টোটকা মাদুলি নাগাৎ রকমারি চেক্নাই কথার আসর জমালো সে। কলকাতার ঘরবাড়ী টেরাম-বাসের গল্প শুনতো আমার কাছে। পড়ন্ত বিকেলের অলসতায় হাঁসের মতো গলা উঁচিয়ে নাক দুটো ফুলিয়ে চোখদুটো ছেড়ে দিত পদ্মবৌ, হলুদে-আগুন সরষে ক্ষেতের দিকে। তারপর কথার ফাঁকে

ফাঁকে আনমনা হয়ে উঠতো। সকাল নেই সন্ধ্যা নেই আহ্লাদিকে কোলে নিয়ে অবিশ্রাম কথার বিনুনী বুনে চলত পদ্মবৌ। সারাদিনের খাটুনির শেষে আলগা কথার আলসেমিতে কেমন যেন মোহতন্ময় হয়ে পড়ি এক এক দিন। সারাদিনে পদ্মবৌয়ের কি-ই বা এমন কাজ! স্বামী বেচারা তো বারমুখো। সঙ্গী বলতে শুধু এই দুধসাদা ছোট্ট বিড়াল আহ্লাদী। বাঁজা আঁটকুড়োর আর কেইবা আছে বলো।—দাওয়ার খুঁটিতে গা এলিয়ে গুনগুনিয়ে ওঠে পদ্মবৌ—

রেতের চাঁদ আর দিনের সুয্যি
যমজ দুটিভাই।
আবাগীর ঝি'র পোড়াকপাল
ছাওয়াল কেনে নাই।

কখন হঠাৎ গান থামিয়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে: ঠাকুর, দেইখেছিস্ মোর আহ্লাদিরে?

—কি?

—ছাওয়াল ধরবো গো। চাঁদনি রেতের মতো ফুটফুটে।—একটু থেমে ফের আরম্ভ করে: তুই কিন্তুক্ ছেইড়ে দিস্ একফালি জায়গা। নইলে মোর সতীন থাকবে কোথায়?—

আমি হাসি: কেন তোমার ঘরে রাখলেই হবে।—পদ্মবৌ খিলখিলিয়ে ওঠে: যাঃ, তাকি হয়। শেষে দুই সতীনে ভাতার নিয়ে ঝগড়া করি আর কি।—চাতক চোখদুটো ছুড়ে দেয় ইতিউতি। ভাঁজভাঙা গলায় বলে: আমায় নিয়ে এট্টিবার যাবি ঠাকুর?

: কোথায়?

: ধরমপুরে, ভগবান সাধুর আটচালায়।

: সেখানে কি?

: সেখানে—? ধ্যেৎ! আচ্ছা মনিষ্যি নিয়ে পড়লাম যা!—পিটপিট করে চোখদুটো ফড়িং-এর মত ডানামেলে উড়তে চায়: ছাওয়াল ধরবার পথ্যি জানে সে, সাক্ষাৎ দেবতা। যাবি ঠাকুর, বেস্পত্‌বার দুপুর নাগাৎ?—বিবশ ঠোঁট দুটোতে জোঁশ পাইনা ফুলঝুরি ছোটাবার। পদ্মবৌ সচল হয়ে ওঠে: বুইঝেছি, সে ডর নেই কো। তোর প্রাণকেষ্ট তেমন নয়। তুই আবার তার কাছে ভিন্‌মরদ নাকি?—যাবি তো ঠাকুর, বল, হক্ কতা দে।—চুপ করে থাকি। মুচকি হেসে ফেলে পদ্মবৌ। তারপর দমকা হাওয়ার মতো হঠাৎ উঠে

দাঁড়ায়। ঝুম্ করে ছুড়ে ফেলে দেয় আহ্লাদিকে উঠানে।· বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ছুক্কিচালে ছুট্ দেয় পদ্মবৌ ডোবার দিকে।

দিন গড়িয়ে রাত। আর রাতের আড়মোড়া ভাঙা দিনের দৌড়ে সপ্তাহ মাস সরে সরে যাচ্ছে। শীতজ্বর ডিসেম্বরের নেতানো পাতায় জুনের খরোজ্জ্বল সূর্যের অসংকোচ প্রহার। আমতলীর খালে কেরায়া-ঘাসিনৌকার নির্বিবাদ বিচরণ। কাঠশুকনো ফারাক জমিনে লাঙলের ফালের আর গরুর খুরের ক্ষত। হোগলা বাদায় আগুনের মাতামাতি। মাঠে মাঠে বীজবোনার স্বপ্ন-স্বয়ম্বর। মাঝে মধ্যে প্রাণকেষ্ট ঢুঁ মারে আমার কুঁড়েতে, পরামর্শের জন্যে। গেরামের চাল শহরে পাচার হচ্ছে। বীজধান খোরাকীতে যাওয়ায় রোঁয়ায় পড়েছে হাতটান। এট্টা কিছু বিহিত না কর্লেই নয়।—এদিকে তেমনটি আছে পদ্মবৌ। চড়ুইপাখীর মতো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ঘুরে বেড়ানো। কখনও হঠাৎ হুটকরে ঢুকে পড়ে কুঁড়েতে। এক গোছা এলোপাথাড়ি কথা ছুঁড়ে চলে যায়। এঁদোপুকুরে তাল পৈঠেয় পা ছড়িয়ে গুণগুণিয়ে ওঠে। আবার কখনও ঘোড়ানিম গাছতলায় পিটুলির আঁক টানে একমনে। বিকেল গড়ালে তামার পয়সা সিঁদুর টিপ্ কপালে জ্বলজ্বলে সিঁথির ওপর টেনে দেয় কলাপাতা ঘোমটাটা। একবাটি নুনজড়ানো জাম নিয়ে ঘরে ঢোকে। ট্যাপাকুল গালের কোনো আধো আধো সোয়াস্তির হাসি: জানিস ঠাকুর?

: কি?

: এবার সত্যি তাইড়ে দেবো আহ্লাদিরে।

: কেন?

গুণ্ গুণিয়ে ওঠে: নয় নয়, ও সতীন আর আমার নয়,

নিজের ঘরে সোনার ছাওয়াল

বাঁশীর কাজ কি বাঁশে হয়?

সমস্ত মুখে লজ্জার আরক্তিম রেখা টেনে মুচকি হাসির ঠুনকো লহর তোলে। একহাটু তরল অন্ধকার পেরিয়ে দুর্লভ হয়ে যায় পদ্মবৌ লাউমাচার নীচে।

সেদিন কাক না ডাকতেই প্রাণকেষ্টর হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভেঙে যায়। তিরিক্ষে মেজাজ সপ্তমে চড়ে। একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোবার জো আছে!

ষতরাজ্যের পাঁচমেশালী ঝক্কি সব আমার ঘাড়ে। কার কত দাদন বাকি, তোলা কমতির জন্যে ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে তদারকি—এ সব কি আমার পোষায়? চেয়ে-চিন্তে বর্তে গেলেই হলো। আপ্‌নি বাঁচলে বাপের নাম। হিড়হিড় করে বাইরে টেনে নিয়ে আসে প্রাণকেষ্ট। মনের ভাবটা আঁচ করে ফেলে। একগাল হেসে নেয়:—মিছিলে যাবার জইন্যে নয়, পদ্মবৌ ছাওয়াল ধরেছে!—ছিটকে পড়ি দাওয়া থেকে। এগিয়ে যাই পায়ে পায়ে। দরমার ঝাপটা খুলে মুখটা বাড়িয়ে দিই ভিতরে। ভাঙা মালসায় তুষের আগুনের উঠকো গন্ধ। ঘরের এককোণে বুড়ি দাই। আমায় দেখতে পেয়ে মিন্‌মিনিয়ে ওঠে পদ্মবৌ:—নে যা তোর ছাওয়াল ঠাকুর।

হুপা হটে আসি: আমার!

: হা গো, তোর নয় তো কার। আমার আহ্লাদিই আছে। এ ছাওয়াল তোকেই দিলাম। নেকাপড়া শিইখে মনিষ্যি কইরে দে।—একটু থেমে দাইকে শুধোয়: ছাওয়ালের বাপ কইয়ে লক্ষ্মিমণি।

: গঞ্জে গেছে।

: গঞ্জে?—অসহায় চোখ দুটো সাক্ষী মানতে চায় আমাকে।

: দেখ্‌ ঠাকুর মিন্সের ব্যাভারখানা! যার ছাওয়াল তার নেই পাত্তা। কেবল রাজ্যি রাজ্যি ঘুরঘুর ফুরফুর। ঘরে নেই ভাত, বলে অন্যের হা-ভাত। ধম্মে সইবে না।—কঁকিয়ে ওঠে পদ্মবৌ।

এখন তেমনটি আর আসে না পদ্মবৌ। ছেলেকে নিয়েই অষ্টপ্রহর। সকাল-সন্ধ্যে আদরে আটখানা হয়ে আছে। এদিকে আমার অবস্থাও ভাল নয়। দুদণ্ড বসে কথা কইবার মতো ফুরসুৎ কোথায়? তিন মাস হলো মায়না মিলছে না। বাড়ীতে হাত পাতবারও যো নেই। ভিখ্‌মাগা কলাটা-মূলোটা দিয়ে কদিন চলে। একটা হেনেস্তা করে তবে ছাড়বো। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করবার দায় পড়েনি আমার।

সেদিন লোকজনের ভীড়ভাট্টায় দাওয়া সরগম। প্রাণকেষ্টর দল মারমুখো। ফুলে-ফেঁপে উঠেছে ওরা। বীজধান কজ্জ দিতে হবে। গুদাম বোঝাই চালের আড়ৎ পোকামাকড়ের বাসস্থান করা চলবে না। নোনা জল জমিনে ঢুকিয়ে সমবছরের খোরাকী কেড়ে নিতে দেবে না বুদ্ধিশ্বর গোলদারকে। ঘেরাও করবে মাদারদহ ইউনিয়ন বোর্ড অফিস।...আমি একটু তফাতে ছিলুম।

নিজেকে নিয়েই সাত ছিনদ্দি।—কিন্তু শেষপর্যন্ত নামতে হলো। নেকাপড়া জানা লোক না থাকলে কে তদ্বির করবে শুনি?

সকাল সকাল দলবল নিয়ে গেলুম ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে। সারাদিন তীর্থকাকের মতো বসে থাকতে হলো বোর্ডঅফিসের চৌহদ্দির ভিতরে। হয় এট্টা বিহিত করুক, নইলে কেউ এক পা-ও নড়বে না। পিসিডেণ্টবাবু অনেক কসরৎ করলেন। হলো না ফয়সালা কিছুতেই। থানা-পুলিশ আসলো। প্রাণকেষ্ট তো মারমুখো। লাঠির ভয়ে মাথা নিচু করবার মতো মরদ তারা নয়।

—শেষ পর্যন্ত ফিরলুম সন্ধ্যা নাগাৎ। দাবী মিটলোও বটে। কিন্তু কতকগুলো চেনা-পরিচয় মুখের আদল পরিচিতির খেই হারিয়ে ফেললো।……

কালোজাম ভরসন্ধ্যায় কুঁড়েতে ঢুকে দেখি পিদিম জ্বালিয়ে বসে আছে পদ্মবৌ। ছাওয়াল কোলে ছড়া কাটছে। ঘরে ঢুকতেই গলগলিয়ে উঠলো: ছাওয়াল মোর লায়েক হতে চললো। এবার দেইখে নেবো মিন্সের চুকচুকানি। ঝ্যামন ঢেমনাচিতি তেমনি তার লাঠি।—শ্রান্ত চোখদুটোকে ছুঁড়ে দিলুম কলাপাতা ঘোমটার দিকে। বেপথু পা দুটো টলছিল। দেয়াল ঘেসে দাঁড়ালুম জামা খুলবার জন্য। পদ্মবৌ ফের জিজ্ঞেস করলে: মিন্সে কোথায়?—সংক্ষিপ্ত জবাব দিলুম: গঞ্জে গেছে—কাল বিকেল নাগাৎ ফিরবে।—মাথা নিচু করে ঘাড়ের রগ-দুটোকে ফুলিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইলো পদ্মবৌ। তারপর হঠাৎ গর্জে উঠলো: তা ফিরবে কেনে, মুই কে? মুই তো শত্তুর, দু' চোখের বিষ। বলি, এ মরা ছাওয়াল আমার ঘাড়ে কেনে? নিয়ে যাক মিন্সে তার বেটাকে। মুই পুষতে পারবো না।—রেগে ছেলেকে দুম করে ফেলে দিলো মাটিতে। কোন কথা বললাম না। জামা খুলে ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে রইলুম জড়ের মতো।

সাঁঝ-সকালে বাইরে বেরোতেই দেখি পদ্মবৌ। তালপেঠের উপর একগাদা এঁটো-বাসন মাজছে। আমায় দেখে হুট্ করে ছুটে এল। কলাপাতা ঘোমটাটা আজ বেশ উঁচু উঁচু লাগছিলো, সিঁদুর ঘামে ভিজে ছড়িয়ে পড়েছে সারা কপালময়। ছেলে উঠবার আগেই বাইরের কাজ সেরে ফেলে পদ্মবৌ।

ভিজে হাত আঁচলে মুছে ঘোমটাটা খুলে দিয়ে ফিক্ করে হেসে উঠলো। শরীরটাকে এলিয়ে দিলো চটকা গাছের ওপর : বলি আজ কোন্ দিকে সুয্যি উঠেছে গো ঠাকুর! এত সাঁঝসকালে কোতায় চললে, এদিক-ওদিক নয় তো? —কি যেন একটা ইংগিত করতে চাইছিল সে। আমি তাতে খেয়াল করলুম না। যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললুম : বা:, যেতে হবে না গঞ্জে? নইলে তোর মিন্সেকে কে আনবে শুনি? সব ব্যাপারেই তো ঠাকুর!—আর একদমক হেসে নিল পদ্মবৌ। আমায় দাঁড়াতে বলে ছুট দিলো ঘরমুখে। দৌড়ে এসে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলো লাউগাছতলায়। একটা ছোট্ট পুটলি এগিয়ে দিলো : দিস্ এটা মিন্সেকে। কাল শিবের পূজা ছিলো। দুটি মুড়ি-মুড়কি আছে ওতে!—আমি দাঁড়ালাম না। কখন যে পুটলিটা হাতে তুলে নিয়েছি খেয়াল নাই। তারপর ভারী ভারী পা দুটোকে টেনে টেনে এগিয়ে চললুম। বাদায় নেমে ঘাড় ফেরালুম দক্ষিণে। দেখি, চটকা আর ঘোড়ানিম গাছের আড়ালে ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলাপাতা ঘোমটা টানা পদ্মবৌ।

ষ্টেশন টাওয়ার ক্লকের ছোট ডায়েলটা কুড়ি ডিগ্রি কোণ করে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যানিং লোক্যাল লেট করে পৌছল শিয়ালদা ষ্টেশনে। উঠে দাঁড়ালুম, দরজা খুলে ভাঙা সুটকেশটা তুলে নিলুম হাতে। জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে বোচকাটা তুলতেই দেখি সেই পুটলিটা। থমকে দাঁড়ালুম মুহূর্তের জন্যে। একটা হতচকিত মাদক অনুভূতি অবশ করে ফেললো সমস্ত চৈতন্যকে। ঢেলে দিলো স্নায়ুর শিকড়ে বরফ চোঁয়ানো জল। এই যা : পুটুলিটা ত' দেওয়া হলো না! শান্টিং করা রেলের কর্কশ সিটির আওয়াজে চমকে উঠলাম। পলাতক আসামীর মতো তাকালাম চারিদিকে। একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় টাল খেয়ে পড়লাম বোধহয়। না:, ভুলতো কিছুই হয়নি। এমনি করে পালিয়ে আসা, এমনি মিথ্যে আর প্রবঞ্চনার মধ্যে তো কোন ফাঁক নেই। নইলে গতকালের অমন অবাধ্য মিছিলে পুলিশ গুলি চালাতে যাবে কেন। কেনই বা অমন ছত্রিশ ইঞ্চি প্রাণকেষ্ট হাতির দরাজ বুকের ছাতিটা একটুকরো ছোট সীসের আঘাতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে?

———

॥ তালপাতার বাঁশি ॥

সকালটাতে সুবিনয়ের যত ভয়। ঘর থেকে বেরিয়ে কুয়োতলার দিকে আসতেই সে দেখবে বাবা যথারীতি পেঁপে গাছটার নিচে চাতালের একপাশে দাঁড়িয়ে কয়লার ছাই দিয়ে দাঁত মাজছেন। হাঁটু অব্দি জড়ানো একখানা গামছা। আর অবিকল একটা খাঁচার মত রুগ্ন নগ্ন বুকে ঝোলানো তেলতেলে পৈতেটা বেমানান; সুবিনয়কে দেখে প্রথমে তিনি গম্ভীর হবেন। তারপর মুখ থেকে খানিকটা ছাই থু থু করে চাতালে ছিটিয়ে বলবেন, তোর মার কাছে পয়সা আছে, বাজারটা করে নিয়ে আয়। হুঁ, তারপর রুনুঝুনুকে নিয়ে বসিস একটু।

প্রতিদিন সকালে এই একই কথা শুনে আসছে সুবিনয়। প্রথম দিকে বাবার ভারী গম্ভীর গলাটা তার অসহ্য মনে হত। তারপর ভীষণ বিশ্রী লাগত। কেননা কালক্রমে সে বুঝে ফেলেছিল যে, এই সব অতি সাধারণ আদেশবাক্যের ভিতরে যে ভাবটা অভিপ্রেত তার সংকেত আদৌ রুচিকর নয়। পরপর দু'বার পরীক্ষা দেবার নাম করে সংসারের অন্নধ্বংস করে পাকেপ্রকারে সে প্রতারণা করেছে। সুতরাং, এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ দোকান-বাজার করে ছোট ভাইবোনদুটিকে পড়িয়ে সংসারের দায়িত্ব পালনের আবশ্যিক ভূমিকাটুকু তাকে নিতেই হবে।

এখন আর বাবার কথায় সুবিনয়ের রাগ হয় না। পরন্তু, বাবার গম্ভীর গলার আদেশ মেকী ও হাস্যকর ঠেকে। বিশেষ করে যখন তিনি রীতিমত নির্বিকারভাবে বলেন, 'তোর মার কাছে পয়সা আছে, বাজারটা করে নিয়ে আয়' তখন সে আর হাসি চাপতে পারে না। কেননা সুবিনয় জানে, প্রতিদিন বাজার করার নামে সামান্য কিছু পয়সা নিয়ে বাজার করে যখন সে ফেরে তখন মার সঙ্গে বাধে খিটিমিটি। প্রহসনের সমস্ত ভূমিকাটুকুই তাকে নিতে হয়।

তারপর রুনুঝুনুকে নিয়ে পড়াতে বসানো—উঃ কি বিরক্তিকর, মাঝে মাঝে

তার কান্না পায়। বাবা ন'টা ছাব্বিশের লোকাল ধরেন। সেই অবধি চলে তার পড়ানো-পড়ানো খেলা। অথচ সে নিশ্চিত জানে রুনুঝুনুর কিছু হবার নয়। দু'বছর হল রুনু ঘরে বসে—মাইনে বাকি পড়ায় স্কুল থেকে নাম কাটা গেছে। পড়ায় ওর একটুও মন নেই। সুবিনয় উঠে গেলেই রুনু ছুটবে পাশের বাড়ীর ভাড়াটে বউটির কাছে। সেখানে বসে সিনেমার গল্প থেকে হাল আমলের ব্লাউজের ডিজাইন অব্দি নানা এলোমেলো বকবে। বয়সের তুলনায় ওর মন অনেক ভারী হয়ে গেছে। আজেবাজে প্রসঙ্গে ওর ঝোঁক বাড়ছে ক্রমাগত। ঝুনু অনেক ছোট, দাদাকে বেশ ভয় করে, তারও পড়তে ইচ্ছা নেই। পড়ার ফাঁকে সে ঘন ঘন বারান্দার দিকে তাকাবে। বাবা অফিসে চলে গেলে সুবিনয় জামাটা গায়ে গলিয়ে উঠোনে নামতে না নামতেই ও একছুটে ঢুকবে রান্না ঘরে। বাবার এঁটো পাতের অবশিষ্ট ভাতগুলো গিলবে।

এই সব একঘেয়ে ঘটনাগুলো প্রতিদিনই ঘটে চলেছে, কোন পরিবর্তন নেই। বাবা তাকে বকবেন। বকে যুগপৎ নিজের অক্ষমতা ও সুবিনয়ের অকর্মন্যতার কথা জানান দেবেন সাংকেতিক ভঙ্গীতে। মা বাজার নিয়ে বাস্তবজ্ঞানের অভাব দর্শিয়ে তার অপদার্থতার কথা বুঝিয়ে দেবেন। পড়তে বসেও রুনুর কান দুটো সজাগ থাকবে পাশের ভাড়াটে বাড়ির দিকে। আর নামতা মুখস্থ করতে করতে ঝুনু অদ্ভুতভাবে ঘন ঘন ঢোক গিলবে। সব মিলিয়ে সুবিনয়ের কাছে সকালটা নিদারুণ বিস্বাদ বিরক্তিকর।

রবিবারের সকালটা আরো অসহ্য। বাবার অফিসে যাবার তাড়া নেই। তিনি বারান্দায় সতরঞ্চি পেতে ঘণ্টাদুই ধরে কাগজ পড়বেন। সুবিনয়কে ঘরের মধ্যে রুনুঝুনুকে নিয়ে পড়াতে বসতে হবে। সারাটা সকাল বাবা তাকে ছেলেমানুষের মত আগলে রাখেন। অথচ আজ, হেমন্তের আমেজ জড়ানো রবিবারের সকালটা, বিশেষ করে সকালবেলায় কামানো মোলায়েম গাল, সদ্য লণ্ড্রী থেকে আনা ধপধপে ধুতি আর গতকাল পাওয়া টুইশনির তিরিশটা কড়কড়ে টাকা যখন টাইমপিসের কাগজের কেসের মধ্যে স্পষ্টতই দৃশ্যমান, তখন চনমনে আড্ডাবাজ বেপরোয়া সুবিনয়ের পক্ষে হাতগুটিয়ে বসে থাকা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং সুবিনয় একটা ফিকির খুঁজতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে তার মাথায় একটা নিখুঁত অব্যর্থ ফন্দী খেলে যাওয়ায় সে প্রায় লাফিয়ে উঠে তেল মেখে কাঁধে গামছাটা ফেলে কুয়োতলায় গেল। অনাবশ্যক দ্রুততায় স্নানপর্ব শেষ করে ঘরে এসে পাটভেঙ্গে ধপধপে কাপড়টা পরে রান্নঘরের দোর গোড়ায় এসে হাঁক পাড়ল, মা—শিগ্‌গীর্ খেতে দাও। অরুণের বাড়ীতে

যাচ্ছি। কিছু পরীক্ষার নোট আনতে হবে। মার নিচের ঠোঁটটা একটু কুঞ্চিত হয়ে এল। সুবিনয়ের অস্বাভাবিক ব্যস্ততার কারণ তাঁর অজানা নয়। তথাপি তিনি যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললেন, সে কি, রান্না তো কিছুই হয়নি। সবে তরকারিটা চাপালাম, হয়ে নিক।

সুবিনয় হুড়মুড় করে রান্না-ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে পেতে বসে বলল, আরে ওতেই হবে, তুমি দাও না চট করে। ডাল্-ভাত হয়েছে তো? ব্যাস—বাবা বারান্দা থেকে একবার টেরাচোখে রান্নাঘরের দিকে তাকালেন। তারপর কিছু একটা বলি বলি করেও অনেকটা জোর করে কাগজের পাতায় চোখদুটো ডুবিয়ে দিলেন।

রাস্তায় পা দিয়েই সুবিনয় বুক খালি করে শ্বাস ছাড়ল। বাড়ীর সামনের দোকানটা থেকে এক প্যাকেট চারমিনার কিনে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে দুপাশের নিচু নিচু বাড়ীগুলোর মাঝখান দিয়ে হনহন করে বড় রাস্তায় চলে এল। কামানো পাতলা মোলায়েম গাল, ধপধপে ইস্ত্রী করা জামা-কাপড়, রাস্তার ওপাশে ঢালু জমি ঘেসে বিশাল বিস্তৃত ঝকঝকে নীল আকাশ, পকেটে বেশ কিছু টাকা যার সবটাই সে ইচ্ছেমত খরচ করতে পারে। সব মিলিয়ে একটা হালকা স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব। সে গুন্ গুন্ করে প্রিয় একটি গানের কিছু অংশ স্বগতোক্তির মত আওড়াতে লাগল।

অরুণের বাড়ীর কাছে বাস থেকে নেমে সুবিনয় গট গট করে খানিকটা হেটে যখন ওদের বাড়ীর দোতালায় এসে দরোজায় খুব আস্তে টোকা মারল, তখন দরোজা খুলে মুখ বাড়িয়ে সুবিনয়কে দেখে অরুণের বড় বৌদি বলল : ও, সুবিনয়! এস, অরুণ ঘরেই আছে, দুদিন হলো ওর জ্বর।"

অরুণ খাটের উপর এক গাদা কাগজপত্র নিয়ে বসেছিল। সে ওগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে বলল : আয়, দুদিন ধরে জ্বরে ভুগছি। একলা একলা ঘরে বসে থাকতে বিশ্রী লাগছে। ভাবলাম পুরোনো গল্পগুলো ফাইল করে রাখি।—সুবিনয় জানে নিজের লেখা ছাপা গল্পগুলো মাঝে মধ্যে উল্টে দেখা ওর একটা মস্ত বাতিক। সুবিনয় এর প্রত্যেকটি গল্প ওর মুখে বহুবার শুনেছে। শুনে শুনে গল্পগুলোর ঘটনা, ছোটবড় চরিত্রগুলো, এমন কি বিশেষ বিশেষ বর্ণনীয় জায়গাগুলি অব্দি অবিকলভাবে মনে আছে।

অরুণ আর আজ গল্প পড়তে বসল না। কোলের মধ্যে পাশবালিশটা টেনে

সাতসতেরো গল্প শুরু করল। তারাশংকর, লরেন্স, টলষ্টয়, গ্যঁগা,—রেনোয়াঁ, সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের লক্ষণ, ছবি বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, রোহান কানাই, ওলমেডো, বি-এ ক্লাসে সেই রোগাটে শ্যামলা রঙের সুশ্রী মেয়েটি, গুমোহাবড়ার দিলদরিয়া বন্ধু সুনীল—একটানা এলোপাথাড়ি বকে বকে সুবিনয় হাঁপিয়ে উঠল। শেষে যখন সুবিনয় অরুণের বাড়ী থেকে রাস্তায় নেমে এল তখন দুপুরের রাঙারোদ চারদিকে থিকথিক করছে।

রাস্তায় নেমে নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে এককোনায় দাঁড়িয়ে কাঁচাড্রেনের গা ঘেসে ওঠা পাঁচিলের ওপরকার একটা অতিকায় হিন্দী সিনেমার পোষ্টার দেখতে লাগল। একটা প্রায় নগ্ন সুপুষ্ট নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়ানো মেয়ের ছবি। খানিকক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে পরম বিতৃষ্ণায় হাতের জলন্ত সিগ্রেটটা নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ছুটে লাফিয়ে বাসে উঠে পড়ল।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকে সুবিনয়ের মনে হল এখানে না এলেই ভালো হত। যেহেতু সুবিনয় জানে দু'পাশের বড় বড় জারুল গাছ আর চারদিকের বৃত্তাকার ঘাসেঢাকা মাঠ পেরিয়ে বেশ কয়েক ধাপ সিড়ি ভেঙে লাইব্রেরীর ভিতরে ঢুকে একটা বিশ্রী ঠাণ্ডা একটা অস্বস্তিকর পারিপাট্য আর দম আটকানো গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে তৎপরতার সঙ্গে অনেক লিষ্ট ঘাটাঘাটি করে কাউণ্টারে একগোছা স্লিপ জমা করে দিয়ে ঘণ্টাখানেক নিদারুণভাবে অপেক্ষা করে সবচেয়ে কম প্রয়োজনীয় বইখানা পেয়ে পড়তে বসলেই তার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসবে। তখন সে বারবার বাইরে আসবে, ঘন ঘন কল থেকে জল খাবে, এবং অনেকগুলো সিগ্রেট ধ্বংস করে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হয়ে যখন শেষবারের মত বাইরে বেরিয়ে আসবে তখন নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে থাকবে।

তবু, অনেকটা অজ্ঞানতাবশত স্যাণ্ডেলের চট্‌চট্ শব্দ তুলে হাত দুটো যথা-সম্ভব দুলিয়ে দুলিয়ে বিন্‌বিন্ করতে করতে লাইব্রেরীর সামনে আসতেই মিনতি রায়, উহুঁ দত্ত, উহুঁ ব্যানার্জি—যা হোক একটা কিছু হবে, য়ুনুভারসিটিতে পিছনের বেঞ্চে বসে যার ঘন কোঁকড়ানো বিস্তৃত মনোরম বেণী, রঙদার ভি-কাট ব্লাউজ, সুপুষ্ট বাহুমূল যা সে দিনের পর দিন সোৎসাহে পর্যবেক্ষণ করেছে তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

মিনতি সুবিনয়কে দেখতে পেয়ে খানিকটা এগিয়ে এসে বলল: "কি ব্যাপার আপনি এখানে যে!"

ওর কথাগুলো সুবিনয়ের কানের দু'পাশ দিয়ে দগদগ করে বেরিয়ে চলে গেল। এখানে তার আসাটা যে কারুর কাছে একটা বিস্ময়কর ঘটনা হয়ে উঠতে পারে একথা ভেবে সে ঈষৎ সংকুচিত হলেও ফস করে একটা মিথ্যা জবাব দিল: এই এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। মিনতি বলল: "আপনি বুঝি এদিকেই থাকেন?"

সুবিনয় জবাব দিল: "না আমি ঢাকুরিয়াতে থাকি। তবে প্রায়ই আসি এখানে।" সুবিনয় 'প্রায়ই'-কথাটায় বেশ একটু জোর দিল।

—হুঁ, তা এবার পরীক্ষা দিচ্ছেন তো?

সুবিনয় মিনতির প্রশ্নে বিরক্ত ও অস্বস্তি বোধ করল। তার পরীক্ষা না দেওয়ার ব্যাপারটা যে মিনতি রায়ের মত মেয়ের গোচরে এসেছে একথা ভেবে সে বিস্মিত না হয়ে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে তার একথাও মনে হল আর দশজন চ্যাংড়া শুভানুধ্যায়ীর মত তার এমন একটা দুর্বল জায়গায় আঘাত দেওয়াটা যেন পুরোনো একটা ঘা খুঁচিয়ে তোলা। অথচ, একথা কেউ জানতে বা বুঝতে চায়না যে পরপর তিনটি বছর এর-ওর কাছ থেকে সত্যমিথ্যা বলে প্রতিদিন তাকে কলেজ স্ট্রীট যাবার পয়সা জোগাড় করে, দিনের পর দিন পেট ভর্তি খিদে নিয়ে পুরো একবছরের বাকী মাইনার একটা কানাকড়ি দিতে না পেরে, ফি দেবার শেষ ক'টা দিন পাগলের মত ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত তাকে পরীক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে হয়েছে। পরন্ত, এমনি একটা মিঠে রোদে ম' ম' করা দুপুরে এমন একটি পরিচ্ছন্ন উন্মুক্ত নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে এমন একটি বিশেষ মেয়ের সঙ্গে তার দেখা, যাকে একদা তার খুবই ভাল লাগত, অথচ এযাবৎ যার সঙ্গে তার বড় জোর বারদুয়েক সামান্য কিছু কথা বলার সুযোগ হয়েছে—তাকে ঠিক এই মুহূর্তেই সুবিনয়ের এমন একটা জবাব দিতে হবে যা নেহাৎ-ই মামুলি ও অর্থহীন। সুবিনয় নিজেকে যথাসম্ভব টেনে ধরে বলল, ঠিক নেই। নানান ঝামেলা, পড়াশুনোয় কিছুতেই মন বসাতে পারছি না।"

মিনতি ম্রিয়মাণ গলায় বলল, "মিছিমিছি দেরী করে লাভ কি। দিয়ে ফেললেই হয়।" সুবিনয় বুঝতে পারল এর চেয়ে বেশি কিছু বলবার মত সম্পর্ক বা জোরালো যুক্তি মিনতির নেই। সুতরাং সে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে চাইল, —"তারপর, আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি?"

মিনতি বলল, "না, ক্যান্টিনে যাচ্ছি। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, চা খাব। আপনিও আসুন না।"

সুবিনয় গলার স্বর ঈষৎ চড়িয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল, "না,

আপনিই যান। অনেক দূর থেকে বন্ধুটি আসছে। ওর সঙ্গে দেখা না করলেই নয়।"

মিনতি হাসল, "আচ্ছা, চলি তবে। লাইব্রেরীতেই আছেন তো?"—মিনতি ঘুরে দাঁড়াল।

সুবিনয় বলল, "হ্যা হ্যা, খানিকক্ষণ আছি।"

মিনতি চলে যেতেই সুবিনয় কল্পিত বন্ধুটিকে তারিফ করতে করতে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে হলঘরে ঢুকল। র‍্যাক থেকে গুচ্ছের বাংলা ম্যাগাজিন টেনে বের করে কোণের দিকে একটা চেয়ারে বসে সেগুলোর পাতা উল্টাতে লাগল। কিছু প্রবন্ধের হেডিং এবং কয়েকটা গল্পের প্যারা বার দু'য়েক পড়ে সে কবিতা পড়তে সুরু করল। কিছু কবিবন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে রীতিমত আধুনিক কবিতা পড়ে পড়ে এখন সে চট করেই মোটামুটিভাবে প্রতিটি লাইনের ধ্বনিগত অর্থ চিত্রকল্প বা চকিত শব্দযোজনার রহস্যটুকু বেশ ধরতে পারে। এবং সত্যি বলতে কি তার কবিতা পডতে ভাল লাগে। সারাদিন নানা কাজে-অকাজে রেষ্টুরেন্টে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে বা রাত দশটা নাগাৎ টুইশনি সেরে বাড়ি ফিরবার মুখে বিনবিন করে কবিতা আউড়ে সে তার জটিল দলাপাকানো বিশৃঙ্খল চিন্তাগুলোকে খানিকটা আল্‌গা করে দিতে পারে। আগে রাতে বাড়ী ফিরে খাওয়ার পর বারান্দার অন্ধকারে একা একা পায়চারী করতে করতে সে বেশ কিছুটা চেঁচিয়ে কবিতা পড়ত। পাশের বাড়ীর লিকলিকে হতকুচ্ছিৎ পড়ুয়া মেয়েটি এ নিয়ে কৌতুক করায় (যা সে রুনুর মারফৎ জানতে পেরেছিল) এখন আর চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে না। কবিতা তার ভারী ভাল লাগলেও আজ এই সাপের চামড়ার মত রবারের মেঝে, লাইব্রেরী হলের অভাবনীয় গাম্ভীর্য, পড়ুয়াদের তন্ময়ভাব—, কাঠের শার্সিতে লটকানো শীতের শেষ বেলার বিবর্ণ আলো, পকেটের কড়কড়ে নোটগুলো—সব মিলিয়ে তার উড়ু উড়ু মনটা কিছুতেই কোন একটা বিশেষ কবিতার আদ্যন্ত বক্তব্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে না পারায় সে খানিকক্ষণের মধ্যে উঠে দাঁড়াল এবং হন হন করে বাইরে বেরিয়ে এসে ঘাসের মধ্য দিয়ে হাটতে হাটতে বুক পুরিয়ে নিঃশ্বাস নিতে লাগল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল এই বিবর্ণ নিঃসঙ্গ বিকেলে যে-কোনো একটা সিনেমা হলে ঢুকে সন্ধ্যাটা কাটালে মন্দ হয় না।

সিনেমা হলে ঢুকে সে বেশ অনায়াসেই একটা দশটাকার নোট কাউণ্টারে ঠেলে দিয়ে একটা দামী টিকিট কিনলো। হাতে টাকা এলে তার মনটা আচম্‌কা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সে মরীয়া হয়ে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় সব

টাকাগুলো খরচ করে যেন কিছুটা হাল্কা হয়। তারপর গোটা মাস ধরে নিদারুণ অনটন। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে বাড়ীর পাশের দোকান থেকে বিড়ি সিগ্রেট ধারে কিনে সারাটা মাস ধরে আসছে মাসের টুইশনির টাকার প্রতিটি পাইয়ের নিঁখুত খরচের হিসেব।

পৌনে নটায় শো ভাঙবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সুবিনয় তন্ময় হয়ে সিনেমা দেখল। বইটার কাহিনী নিতান্তই জোলো চিফ সেন্টিমেন্টে ঠাসা নায়ক নায়িকার ন্যাকামি অসহ্য, ডিরেক্টরের হ্যাকনিড টাচগুলো যে কোন সচেতন দর্শকের পক্ষেই বিরক্তিকর; কিন্তু এসব তত্ত্ব চট করে তার মাথায় খেলল না, যা সে আগামীকাল কফি হাউসে গিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বন্ধুদের কাছে বলে স্বস্তি পাবে। আপাততঃ সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে হাটতে হাটতে তার মনে হল সম্প্রতি কলকাতায় অত্যন্ত জঘন্যভাবে লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে। সুতরাং সে খানিকটা নির্জনতার খোঁজে প্রথম একটা নিরিবিলি রেষ্টুরেন্টে ঢুকে এক কাপ চা আর দুটো টোষ্ট খেয়ে রাস্তায় নেমে ফুটপাথের একপাশ দিয়ে হাটতে লাগল। আর মনে মনে সদ্য দেখা সিনেমার কাহিনীটির সঙ্গে নিজের জীবনটাকে জড়িয়ে একটা মনোরম গল্প তৈরী করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়ে শেষে অনেক রাতে একটা ট্রামে চাপল। তারপর নির্ধারিত জায়গায় নেমে খানিকটা পথ হেটে অন্ধকার গলিপথ দিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে যখন রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল তখন পলকা হাওয়ায় নিবু নিবু ধোয়াটে কুপির আলোয় সে দেখতে পেল মা উনুনের সামনে ভাজকরা হাটুর ওপরে হাতদুটো প্রলম্বিত করে ঝিমুচ্ছেন, আর তাঁর পাশে আদুল গায়ে পিড়িতে বসে ঝুনু ঘুম ঘুম চোখে ভাত খাচ্ছে।

সুবিনয় দরোজার খুটিতে শরীরটা ঠেকিয়ে ফিস ফিস করে পরিচিত ভঙ্গীতে ডাকল, মা, ও-মা—

মা আচম্কা জেগে উঠে গজ গজ করে বললেন, এতক্ষণে আসা হল। একটু কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে, একহাটু রাত, বাড়ীর লোকগুলোর কথাও তো ভাবতে হয়। সুবিনয় জামার বোতাম খুলতে খুলতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, অরুণের বাড়ী গিয়েছিলাম, এক গাদা নোট করতে দেরি হয়ে গেল।

মা ধমক দিয়ে বললেন, থাক্ থাক্ হয়েছে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে আয় তো। ওদিকে তোর বাবা বাতের ব্যাথায় কাৎরাচ্ছে, মালিশ করতে হবে। আমার হয়েছে যত ঝামেলা—

সুবিনয় হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে এল। মা পরিপাটি করে সাজিয়ে ভাতের

থালাটা তার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, জানিস, আজ দুপুরে বকুল এসেছিল। পুরো গ্রাসটা শেষ না করেই সুবিনয় বলল, কে, বকুল মামা, বম্বে থেকে কবে ফিরল?

মা আরো খানিকটা ঘন হয়ে বসে বললেন, দিন দুয়েক হয়েছে। অফিসের কি একটা জরুরী কাজে এসেছে। বুধবার চলে যাচ্ছে। ওকে তোর কথা বললাম, তোর বাবাও বললেন অনেক করে। বড় চাকুরে, যদি তোর একটা চাকরী জুটিয়ে দিতে পারে, সংসারের যা হাল—

সুবিনয় দপ করে নিভে গিয়েই মাথা নিচু করে ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাতগুলো গিলতে লাগল, মাথা তুলে মার দিকে তাকাতে ভয় হল। কেননা সে জানে মার ঘোলাটে আশাক্লান্ত আধবোঁজা চোখদুটোর নিচের ঘন কালির রেখা কেমন করুণ। সুবিনয় জানে বকুল মামা টুনু মামা রবি কাকা এবং আরো অনেকে এই বাড়ীতে তার মার কাছে হলপ করে তার চাকরী জুটিয়ে দেবার আশ্বাস দিয়ে আর চৌকাঠ মাড়ায়নি। একটা অসহ্য ক্ষোভে যন্ত্রণায় সে কলের পুতুলের মত নিদারুণ অস্বস্তিতে খাওয়া শেষ করে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল কুয়োতলায়। তারপর, হাত মুখ ধোওয়া হলে গুটিগুটি করে সিড়ির তলার ছোট্ট ঘরটাতে ঢুকল। একটা সিগারেট ধরিয়ে মেঝেয় হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে অর্থহীনভাবে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ উপরের দিকে। তারপর উঠে বসে খাটের তলা থেকে কিছু পরীক্ষার নোট বের করে হারিকেনের সলতেটা উসকে দিয়ে সে পাতার পর পাতা উল্টোতে লাগল।

গভীর রাতে বারান্দা কুয়োতলা সমস্ত গলিটা সমস্ত পাড়াটা অন্ধকারে ঘন কঠিন নিস্তব্ধ হয়ে এলে সে নোটগুলো যথাস্থানে রেখে উঠে দাঁড়াল। পাশের ঘর থেকে ঘুমের মধ্যে কঁকিয়ে ওঠা ঝুনুর দুর্বোধ্য গলার স্বর কানে বিঁধতেই দরোজায় খিল এঁটে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে তাকাতেই তার সমস্ত মনটা ধীরে ধীরে একটা মৃদু তৃপ্তিতে ভরে যেতে লাগল। সন্ধ্যের সময় নিপুণভাবে গুছিয়ে রাখা ধপধপে বিছানার শিয়রের কাছ রেকাবীতে ঢাকা একগ্লাস জল, চলটে উঠা চিনেমাটির অ্যাসট্রে, হ্যাংগারে ঝোলানো জামাকাপড়লুঙ্গি রুণুর সমস্ত সতর্কতার মধ্যে একটা গভীর সংকেত খুঁজে পেয়ে মশারীর ভিতরে ঢুকে ক্লান্ত দেহটাকে বিছানার মধ্যে ভাসিয়ে দিতে দিতে সুবিনয়ের মনে হল তার বাবা তার মা কত অসহায়, রুণু ঝুনুর ইচ্ছাগুলো কত করুণ, অরুণের লেখক হবার স্বপ্ন কত রঙীন। এইসব সাতসতেরো ভাবতে ভাবতে সে মনে মনে একটা নিটোল ছবি আঁকতে আরম্ভ করল। যেভাবেই হোক সে এবার পরীক্ষা দিয়ে দেবে। তারপর মফঃস্বলের কোন একটা কলেজে চাকরী নিয়ে সে মিনতি রায় উঁহু মিনতি ব্যানার্জির মত কাউকে জুটিয়ে নিয়ে রুণু ঝুনু মার সঙ্গে একটা ছোট্ট সুন্দর স্বচ্ছল সংসার পাতবে।

ধীরে ধীরে সুবিনয়ের সমস্ত অনুভূতিগুলো বেণীমুক্ত হয়ে নিবিড় নির্জন রাতের গভীরে মিশে একাকার হয়ে যেতে লাগল।

॥ শীতের বেলায় ॥

সাইকেল রিক্শা থেকে নামতেই অনুতোষ দেখল, ট্রেনটা প্ল্যাটফরম ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ট্রেনের পেছনের অংশটা ক্রমশ ছোট হতে হতে একটা কালো দাগের মত মাটি স্পর্শ করে দূরের গাছ-গাছালির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিকটা ধোঁয়া অর্ধবৃত্তাকারে তখনো শূন্য আকাশে ঝুলছিল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অনুতোষ ছোট করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর রিক্শঅলার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে স্খলিত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে প্ল্যাটফরমের ওপরে উঠে এল।

খানিকটা শানবাঁধানো অংশ বাদ দিলে সমস্ত প্ল্যাটফরম জুড়ে লাল কাঁকর ছড়ানো। তার ওপর দিয়ে ভারী জুতো ঘষে ঘষে হাঁটতে অনুতোষের বিশ্রী লাগছিল। অনুতোষ এই প্রথম অনুভব করল, তার দেহের ভার ও গতি এবং জুতোর ঘর্ষণের এমন একটা স্বতন্ত্র ধ্বনি আছে যা খুবই অস্বস্তিকর। টিকিটঘরের লাগোয়া করোগেটের সেডের নিচে দুসারি বেঞ্চ। অনুতোষের কোমরের দিকটা টন টন করলেও সেদিকে এগুতে সাহস হল না। একহাট অকেজো নোংরা লোকের মাঝখানটায় গুঁতোগুঁতি করে বসা বা বেঞ্চে ছারপোকার কথা ভাবতেই তার সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করে উঠল! অগত্যা সে সামনের দিকে খানিকটা হাঁটতে শুরু করল। চোখ থেকে আলতো করে সানগ্লাসটা খসিয়ে ফেলতেই শীতের নরম রোদ মায়ের স্নেহের মত তার দুচোখ স্পর্শ করল। তাড়াতাড়ি সে পকেট থেকে রুপোর কৌটোটা খুলে একটা সিগ্রেট ধরাল। তারপর ওভারব্রীজের কাঠের সিঁড়িতে পা তুলে একবার অর্থহীন দৃষ্টিতে চারপাশে চোখে বুলিয়ে নিয়ে নাক এবং মুখ দিয়ে ভকভক করে বেশ খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে দিল। ওভারব্রীজের আরো কয়েক ধাপ উঠতেই সে টের পেল শরীরটা বেশ ভার হয়ে এসেছে। বিমলের বাড়িতে প্রচুর খাওয়া হয়েছে। বিমলের বউ অনিমা তরিবৎ করে এটা ওটা সাতসতেরো রেঁধেছিল। বিমল অফিসের জুনিয়ার ষ্টাফ, কয়েক মাস আগে বিয়ে করেছে। বিয়ের সময় কাজের চাপে আসা হয়ে ওঠেনি। তাই ভদ্রতারক্ষার জন্যে

একবার দেখা করে যাওয়া। নইলে কলকাতা থেকে এত দূরে এই অজ পাড়াগাঁয়ে আসার তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

ওভারব্রীজের উপরে উঠে অনুতোষ মাঝখানটায় চলে এল। ব্রীজের রেলিঙে কনুই অব্দি হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল। পাশাপাশি দুজোড়া লাইন। লাইনের নিচে আড়াআড়ি করে সাজানো পুরু তক্তার সার। সেগুলো এক দুই করে গুনবার চেষ্টা করতে কিছুক্ষণের মধ্যে তার দুচোখ ধরে এল। স্টেশনের ওপাশটা ফাঁ ফা দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো মাঠ। মাথার ওপর বিন্দু বিন্দু হলুদে মেশানো সংকেতহীন আকাশ। ব্রীজের গা ঘেষে দুটো ঢ্যাঙা তালগাছ। ওদের কালো কালো বিশাল কাণ্ড দুটো অনেক রোদে জলে ফ্যাকাশে। গাছের লম্বা লম্বা চোখা পাতায় মাঠের জমাটবাধা হাওয়ার দমকা এসে লুটোপুটি খাচ্ছে, পাতাগুলো সিরসির করে কাঁপছে আর তার ভেতর থেকে একটা চাপা গোঙানির মত শব্দ বেরিয়ে আসছে। সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে অণুতোষের মাড়ির দু'পাশে টক টক জল কাটতে শুরু করল। হাতের আধপোড়া সিগ্রেটটা সজোরে নিচের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে গট গট করে' প্ল্যাটফরমের ওপাশটায় গিয়ে নামল।

প্ল্যাটফরমের এদিকটা একেবারে ফাঁকা। পাশের নিচু জমি থেকে মাটি কেটে সবে প্ল্যাটফরমটা উঁচু করা হচ্ছে। অনুতোষ ফের একটা সিগ্রেট ধরাল। ওপাশের টিকেটঘর, টিকেট ঘরের লাগোয়া করোগেটের শেডের তলাকার অকেজো নোংরা লোকগুলো, প্ল্যাটফরমের পেছনকার ঢালু জমিঘেঁসা দোকান ঘরগুলো এবং অসমান টালির চালের সার, তারও ওপাশের মাঠকোঠা ও গলি রাস্তার ফাঁকে-ফোকরে দৃশ্যমান ক্রমঘন নিসর্গ—সবকিছু অনুতোষের কাছে একটা ফ্রেমেআঁটা প্রাণহীন-তাৎপর্যহীন ছবির মত মনে হল। এবং সেই মুহূর্তে সে হাতঘড়ির দিকে চোখ ফেরাতেই মাথার ভেতরকার নিস্তেজ স্নায়ুগুলো কিলবিল করে উঠল। কলকাতার ট্রেন আসতে এখনো অনেক দেরি, ফলে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে—একথা ভাবতেই সে ভীষণ অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল। বিড়বিড় করে বিমলের উদ্দেশে একটা কদর্য গালাগাল দিয়ে ফেলল।

স্টেশনের পরেই নিচু জমি, শীতের হলুদ রোদ চড়িয়ে আছে সারা মাঠ জুড়ে। স্টেশনের ঠিক গা ঘেষেই রেললাইন বরাবর একটা খাদ, তাতে অল্প সবুজে কালোতে মেশানো জল। জলে ইতস্ততঃ সাদা টুকরো টুকরো হাল্কা মেঘসমেত আকাশের পরিচ্ছন্ন ছায়া। মাটি আর কলাগাছ দিয়ে খাদের খানিকটা জায়গা বাঁধা। বাঁধের ঠিক মাঝখানটায় লম্বা লম্বা কতগুলি কঞ্চি পোতা, তার

মাঝখানে একটা চাঁই। চাঁইয়ের মধ্য দিয়ে তিরতির করে এপাশ থেকে ওপাশে জল বয়ে যাচ্ছে। চাঁই শব্দটা মনে পড়তেই সে প্রসন্ন হল। বহুকাল আগে গ্রামের বাড়িতে ছোটমামার সঙ্গে সে চাঁই পাততে যেত মাঠে, বর্ষার শেষে। আলের খানিকটা অংশ দা দিয়ে কেটে চাঁই বসাত। বর্ষার জল ঢালু জমি দিয়ে গলগল করে নামত। সেই সঙ্গে কুচো কুচো কতরকমের মাছ। টেলিগ্রাফের তারে দুটো দোয়েল বসে অবিরত লেজ নাড়ছে। পাখি দুটো দেখে হঠাৎ অনুতোষের মাথায় ছেলেবেলাকার সেই প্রশ্নটা চেপে বসল, দোয়েল এত লেজ দোলায় কেন, আনন্দে—না ছোট শরীরের চেয়ে লেজটা বেশি ভারী বলে? এবং একথা ভাবতেই এই পাখি সম্পর্কে তার ছেলেবেলাকার গেঁয়ো ছড়াটা অবিকল ভাবে মনে পড়ে যাওয়ায় সে ফিক করে একটু হাসল।

চারদিকে রোদ্দুরের আঁশ উড়ছে, রোদের অল্প অল্প তাঁতে ঠোঁটের নরম চামড়া কুঁচকে আসছে। বোবাধরা মানুষের মত একটা বুকচাপা নীরবতায় অনুতোষের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অনুতোষ হঠাৎ স্টেশনের ঢালু জমি বরাবর পা টিপে টিপে খাদের দিকটায় নেমে পড়ল। খাদের ওপরে একটা ছোট বাঁশের সাঁকো। অনুতোষ সাঁকোতে পা দিতেই সেটা ভয়ানকভাবে দুলতে লাগল। মাঠের ওপাশের দূরগ্রামের লোকদের স্টেশনে আসবার জন্য সম্ভবত সাঁকোটা তৈরী হয়েছে। অনুতোষ খুব সাবধানে সাঁকোটা পেরিয়ে মাঠের প্রান্তে এসে পৌঁছল।

ধানকাটা হয়ে গেছে, এখন ধানগাছের গোড়ায় গোছা গোছা অংশগুলো সারা মাঠ ছেয়ে আছে। শীতে মাটি ভেজা ভেজা সংকুচিত; সংকুচিত হয়ে একটা কালচে রঙের হয়ে গেছে। পা ছড়ে যাবার ভয়ে অনুতোষ সাবধানে কাটা ধানগাছগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলতে শুরু করল। কোথাও কোথাও মাটিতে ফাটল ধরেছে এবং সেইসব ফাটলগুলো থেকে অসংখ্য মাঠপোকা অবিরল শব্দের জাল বুনে সমস্ত পরিবেশটা মন্থর করে তুলেছে। এই একঘেয়ে দ্রুত অথচ মৃদু শব্দগুলো অনুতোষের কানে অদ্ভুতভাবে বাজছে। একটা অর্থহীন শূন্যতা উদ্বেগহীন নীরবতা আর মাথার ওপরকার বিন্দু বিন্দু হলুদে মেশানো বিরাট আকাশ, এ সবকিছুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনুতোষের খারাপ লাগল। হুট্ করে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ায় নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল। সে খানিকটা এগুতেই একটা ছোট ঝোপের মধ্য থেকে কতগুলো মেটেরঙের পাখি পতপত করে ডানা ঝাপটে উড়ে কিছুটা দূরে গিয়ে বসল এবং ফোলা ফোলা গলার নিচের দিকটায় ছোট ছোট ঢেউ

তুলে পাগুলো এলাপাথাড়ি ফেলতে ফেলতে তার দিকে বারবার ঘাড় ফিরিয়ে অপরিচিতের মত তাকাতে লাগল। অমুতোষ চট করে মাটি থেকে খানিকটা শুকনো খড় তুলে নিয়ে ঠোঁটের একটু অংশ ফাঁক করে 'হু-স-স' করে একটা শব্দ তুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারল। আশ্চর্য, পাখিগুলো কিন্তু তাতে মোটেই ভয় পেল না। শুধু ডানাগুলো আধখানা তুলে পায়ে হেঁটে কিছুটা পিছনের দিকে সরে গেল এবং পিট পিট করে অমুতোষকে দেখতে লাগল। অমুতোষ এবার বেশ জোরেই হেসে ফেলল। তারপর কি ভেবে ডানদিকে হাঁটতে শুরু করল। সামনে অনেকটা অংশ জুড়ে কলাইয়ের ক্ষেত। গাছগুলো তত বড় হয়নি, ফিকে সবুজ সরু সরু পাতা, কচি কলাপাতার মত মোলায়েম। সে হাঁটু ভেঙে বসে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে দাঁতে চিবুলো। একটু কষকষ স্বাদহীন। অমুতোষের মনে পড়ে গেল তাদের মামাবাড়ির পিছনের জমিতে ধানকাটার পর এমনি কলাইয়ের চাষ হত। সে আর চিনুমামা খুব ভোরে উঠে কুয়াশা ঢাকা মাঠে নেমে কলাই ক্ষেতের সামনে যেত। রাতের শিশির জমে কলাইয়ের পাতাগুলো ভারী হয়ে থাকত। তারা দুজনে পাতায় জমা হাল্কা টলটলে শিশির আলতো করে আঙুলের ডগায় তুলে নিয়ে ফাটা ঠোঁটে লাগাত। এই মুহূর্তে সেইসব কথা মনে পড়ে যেতেই অমুতোষের চোখদুটো টনটন করে উঠল। চারিদিকের বৃত্তাকার মাঠ, মাঠের সীমানা জুড়ে ঘন সবুজে ঢাকা দূরগ্রাম, মাঠ থেকে অনেকটা উঁচুতে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত রেললাইনের বাঁধ, মাথার ওপরকার বিন্দু বিন্দু হলুদে মেশানো সংকেতহীন আকাশ, মাঠপোকার অবিরল মন্থর ডাকে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়া নির্জনতা—এসবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ধীরে ধীরে তার পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। ছোট বয়সে মা মরে যাবার পর সে ঢাকায় মামাবাড়িতে চলে গিয়েছিল, সেখানে থেকেই পড়শুনা করত। বছরে দুবার বাবা এবং ভাইবোনদের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় আসত, গ্রীষ্মের আর পুজোর ছুটিতে। পুজোর ছুটির সময় এমনি বিমর্ষ রোদে ঢাকা ধু ধু উদোম মাঠের মধ্য দিয়ে রেলগাড়িতে করে সে মামাবাড়ি থেকে কলকাতায় ফিরে আসত।

আরো কিছুটা এগোতেই সামনে পড়ল একটা ছোট্ট জলা। ঢালু জমিতে বর্ষার জল জমে জলাটার সৃষ্টি হয়েছে। জলাটা ছোট, হাঁটুজল হবে কিনা সন্দেহ। চওড়ায় চার-পাঁচ হাত। জলার চারপাশে ঘাসঝোপ, ইতস্ততঃ ছোট-বড় কালকাসুন্দের গাছ। গাছের পাতায় শীতের পীতাভ রোদ বিষণ্ণতার মত ছড়িয়ে আছে। কয়েকটা বুনো প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, জলা থেকে একটা

সোঁদা সোঁদা ভাপ উঠছে। অনুতোষের পায়ের শব্দ শুনে দুতিনটে ব্যাঙ বা ঐ জাতীয় কিছু টুপ টুপ করে জলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। কানের দুপাশ দিয়ে তিরতির করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, ঈষৎ আন্দোলিত ঘাসঝোপের মধ্য দিয়ে জাফরিকাটা আলো মাটির ওপর দুষ্টু ছেলের মত খেলা করছে। মাথার ওপর একটা চিল অনবরত পাক খেয়ে ঘুরছে, থেকে থেকে ডেকে উঠছে। একটা বুনো ফুল ছিঁড়ে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকতেই অনুতোষের মনে হল, এই আদিগন্ত মাঠ, জলা, ঝিমধরা নির্জনতা, ঘাসঝোপ, চিলের করুণ মন্থর চিৎকার—সব যেন তার পরিচিত, অতি-পরিচিত। তার মনে হতে লাগল, সে এই জায়গায় এই জলাটার সামনে কবে কার সঙ্গে যেন এসেছিল। অনুতোষ বারবার ভাবতে লাগল, কিন্তু মনে করে উঠতে পারল না। কোমরের কাছে একটা মৃদু ব্যথা মোচড দিয়ে উঠল, সে নিদারুণ অবসন্নতায় ঘাসঝোপের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রায় হাঁটু গেড়ে বসে কাঁপা কাঁপা গলায় হঠাৎ 'মা-মা-মাগো' বলে উঠেই আঁতকে উঠল। অনুতোষ গলার স্বর যথাসম্ভব চেপে 'মা' শব্দটা উচ্চারণ করতে চাইল। কিন্তু শব্দটা রক্তের মধ্যে ফুসফুসের থলিতে কোন স্পন্দন জাগালো না, শব্দটা তার কাছে কৃত্রিম মনে হতে লাগল। বহুকালের অব্যবহৃত মরচে পড়া ধাতব জিনিসের মত শব্দটা অর্ধস্ফুট ধ্বনির সৃষ্টি করল মাত্র। মাড়ির নিচে টক টক জল কাটতে শুরু করল। কপালের দু'পাশের রগগুলো ফুলে উঠল। অনুতোষের মনে হল সে হয়ত কখনো শব্দটা ভালো করে উচ্চারণ করতে পারবে না।

ঠিক এই সময় পিছন থেকে কে যেন 'হেই বাব্‌বা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে অনুতোষ দেখল একটা ছোট ছেলে জলার ওপাশে ঘাসঝোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অনুতোষ বুনোলাতাপাতা কাঁটাগাছ ডিঙিয়ে কিছুটা পথ ঘুরে ছেলেটির কাছে পৌঁছল; ছেলেটি ওকে এগিয়ে আসতে দেখে তড়াক করে পিছনের দিকে খানিকটা সরে গেল। ছেলেটির বয়স ন'-দশ হবে; রোগা, মাটির সঙ্গে কালি মেশালে যেমন দেখায় তেমনি রঙ। হাল্কা জমিনের মোটা লালপেড়ে আধময়লা ধুতি গাছকোমর করে পরা। চোখের সাদা অংশের মাঝখানে ঢলঢলে ঈষৎ সবুজ একজোড়া মণি। হাঁটুর বাটি দুটো গোল গোল। পায়ের পাতা এবং গোড়ালির খানিক অংশ নিয়ে শুকনো কাদা।

অনুতোষ ওর পিছনের দিকে সরে যাবার ভঙ্গী দেখে হেসেই ফেলল, "এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ খোকা?" ছেলেটি চোখ তুলে ওর দিকে এমন তাকাল যে

প্রশ্নটা যেন ও-ই অনুতোষকে করতে চাইছে। কোন জবাব না পাওয়ায় অনুতোষের বিশ্রী লাগল। ঘাসঝোপের কাছে বসে এতক্ষণ ছেলেমানুষের মত যা করছিল সেকথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার চোখেমুখে একটা লজ্জার আভা জড়িয়ে এল। কিছু না বললে কেমন দেখায় এমনি একটা ভাব নিয়ে সে ফের গলায় বলল "তোমার নাম কি খোকা?"

ছেলেটি বাঁ হাত দিয়ে একটা ঘাস ছিঁড়ে চিবুতে চিবুতে নিচু গলায় আনমনা ভাবে বলে উঠল "কানাই।"

—কোথায় থাক?

—হুই-ই হোঅয়—। এই বলে সে দূরের গাছগাছালির দিকে হাত তুলল।

—তোমাদের গাঁয়ের নাম কি?

— নারায়ণতলা।

—পড়াশুনো কর?—প্রশ্নটা নিজের কানেই কেমন লাগল।

—হু-উ-উ। সিকদারপাড়ার পাঠশালায় পড়ি। —ছেলেটি থু থু করে মুখ থেকে খানিকটা ঘাস ফেলে দিল।

পাঠশালা শব্দটা কানে আসতেই অনুতোষের বুকের ভেতরটা হুহু করে উঠল। দূরের গাছগাছালির দিকে তাকিয়ে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল একটা উঁচু পোতা চৌচালা টিনের ঘর, পোতার ওপর হোগলা দিয়ে তৈরী চৌকো, চৌকো কয়েকটা মাদুর বিছানো, মাদুরগুলো ধুলোকাদায় কিচকিচ করছে। চারিদিকে ঘন হয়ে আসা আমকাঁঠাল কলাগাছের ঝোপ। কয়েকটি ছেলে সেখানে বসে কঞ্চির কলম দিয়ে মাটির দোয়াত থেকে কাঠকয়লা গোলা কালি নিয়ে গোল গোল করে অ-আ-ক-খ লিখছে।

অনুতোষ ছেলেটির গা ঘেঁষে দাঁড়াল, "দুপুরবেলা এখানে কি করছ?"

—মাছ ধরছি।

—মাছ, কি মাছ?

—একচোখা মাছ।

—বা-রে, মাছ ধরবে ছিপ কোথায়?

—এইতো।—ছেলেটি ঘাসঝোপের ভেতর থেকে সাদা কাটিম স্তোয় জড়ানো একটা বড় কঞ্চি তুলল।

—কই, স্তোয় ব'ড়শি তো নেই।

ছেলেটি অনুতোষের দিকে আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে হিহি করে হেসে উঠল, "একচোখা মাছ ধরতে বঁড়শি লাগে নাকি?"

কঞ্চিটা হাতে নিয়ে অনুতোষ মাছ ধরার রহস্যটা বুঝতে পারল। সুতোর আগায় ছোট একটা ফাঁস, মাছগুলো ভেসে উঠতেই আস্তে করে ওদের মাথা বরাবর ফাঁসটা নামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি টেনে তুলতে হয়। অনুতোষ ছেলেটির কাঁধে একটা হাত রাখল। ওর তেল কুচকুচে গা থেকে একটা বুনো গন্ধ উঠছে। ওর শরীরটা নরম, ঠাণ্ডা। হঠাৎ তার মাথায় একটা ফন্দি খেলে গেল। এবং সেই মুহূর্তেই খেয়াল হল পায়ের ভারী জুতো, কোমরে চওড়া নাইলনের বেল্ট, আঁটোসাঁটো করে বাঁধা দামী ইটালীয়ান ট্রাউজার, কব্জি অব্দি ঢাকা কড়কড়ে টেরিলিনের জামা, গলায় শক্ত করে জড়ানো টাই—এসব তার শরীরটাকে চেপে ধরে রয়েছে। অনুতোষ দ্রুত টাইটা আলগা করে, কব্জি থেকে ক্লিপ খুলে হাতটা আস্তিন পর্যন্ত টেনে নিয়ে, জুতোজোড়া খুলে মোজা দুটো জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, ট্রাউজারটা হাঁটু অব্দি গুটিয়ে নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারপর হেসে জলার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই কানাই, এটা এক লাফে পার হতে পারবে?"

ছেলেটি হকচকিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল, "তুমি পারবে?"

—হ্যাঁ, পারবো—।

—কই দেখিতো—

অনুতোষ সার্কাসের জোকারের মত জুতোজোড়া চট করে হাতে তুলে নিয়ে কিছুটা পিছনের দিকে হটে গেল। তারপর হাঁটু দুটো সামান্য ভেঙে গতি সঞ্চয় করে 'ওয়ান-টু-থ্রি' বলে চেঁচিয়ে উঠে এক লাফে জলার ওপাশে গিয়ে পড়ল। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠে হাততালি দিতে দিতে নিজের চারদিকে বোঁ-বোঁ করে দুবার ঘুরে গেল। শুকনো খোঁচা খোঁচা খড়ের গোছার ওপরে পড়ায় অনুতোষের হাঁটুর নিচের খানিকটা অংশ ছড়ে গেল। 'দেখলে তো কেমন লাফাতে' পারি বলে সে হাঁপাতে লাগল। স্তব্ধ জলে থেকে থেকে বুড়বুড়ি কাটছে, জলার পারে কয়েকটা শামুকের ভাঙা খোল ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে বেলেগুড়ের দানার মত গুটি গুটি পোকা বা জলজ উদ্ভিদে জলটা কালো হয়ে আছে। ছেলেটি ওপাশ থেকে ঘুরে তার পাশে এসে দাঁড়াল। অনুতোষ পা ধোওয়ার জন্যে জলের দিকে উবু হয়ে এগিয়ে আসতেই দেখল, কালো জলের মধ্যে বিরাট আকাশের ছায়াটা কেমন যেন নিষ্প্রভ, বিষণ্ণ। জলে তার ঝুঁকে পড়া গোটা শরীর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। বিস্রস্ত চুল, গোটানো আস্তিন, হাঁটু অব্দি নগ্ন দুখানা পা এবং চোখ দুটো তুলনায় আরো আয়ত। অনুতোষ যেন নিজেই নিজেকে চিনতে পারছে না। ছেলেটা বলে উঠল, কি দেখছ জলের ভেতর?

অনুতোষ তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে নিয়ে বলল, "ও কিছু না। এস কানাই, আমরা একটু খেলা করি।"

ছেলেটি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, অবাক হয়ে বলল, "খেলবে, কি খেলবে?"

'যা হয় একটা কিছু' বলতে বলতে সে ছেলেটির কনুই ধরে টেনে ঘাস-ঝোপের দিকে এগিয়ে এল। ছেলেটি ডানহাতের মধ্যের আঙুলটা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে কি ভাবল, বোধ হয় একটু লজ্জা ও পেল বা, বলল, "ধ্যেৎ! খেলা হবে না। এস ফড়িং ধ'র।"

—ফড়িং, ফড়িং কোথায়?

—ওই তো, ওইখানে—ছেলেটি সামনের দিকে হাতটা বিস্তৃত করল। অনুতোষ বলল, বেশ, তাই চলো।

ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে ঝোপের ধারে বসে আড়ি পেতে পটাপট অনেকগুলো ফড়িং ধরে ফেলল। লম্বা ধূসর রঙের মেঠো ফড়িং, পাখনাগুলো খসখসে। ওরা ফড়িং ধরে হাতের তালুতে রেখে 'ফু' করে সেগুলো মাঠের দিকে উড়িয়ে দিতে লাগল। দ্রুত ধাবমান ফড়িংয়ের পাখনার শব্দে, মেঠো-পোকার অবিরল ডাকে, বুনো ঘাস আর ঝোপের ভেতরকার আইঠালি আর ঘেঁটুপাতার উগ্র বনজ গন্ধে অনুতোষ তন্ময় হয়ে রইল। ধীরে আকাশের রঙ ফিকে হয়ে আসছে। মেঘের হাল্কা ছায়া পলকের মধ্যে মাঠের ওপর দিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, চারদিকে একটু একটু করে কুয়াশা নামছে, হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই অনুতোষ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। ছেলেটি বললে, "কি, আর ফড়িং ধরবে না?"

অনুতোষ টাইটা ঠিক করতে করতে বলল, না, যেতে হবে এখন। তুমিও চল আমার সঙ্গে।

ছেলেটি বলল কোথায়?

—স্টেশনে।

—না আমি বাড়ি যাব, সন্ধ্যে হয়ে এল।

অনুতোষ পকেট থেকে মানিব্যাগটা তুলে খুলতে খুলতে বলল, "আচ্ছা, তবে দাঁড়াও একটু।"

ছেলেটি এবার ওর দিকে তাকিয়ে যেন ভয় পেয়ে গেল। তারপর কঞ্চিছিপটা হাতে তুলে নিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলল। অনুতোষ পায়ের গোড়ালি উঁচু করে হাত তুলে ওকে ডাকবার জন্য সচেষ্ট হল।

ছেলেটি ততক্ষণে মাঠ ছেড়ে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে কলাগাছের ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনুতোষ চিৎকার করে ওকে ডাকতে চেষ্টা করল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে ওর নামটা মনে করতে পারল না। মাথার ওপর একটা চিল শেষবারের মত ডেকে চলেছে। সেই চিলের করুণ মন্থর ডাকে অনুতোষের হাত পা পায়ের গোড়ালি, চোখ, চোখের দুপাশের সংক্ষিপ্ত জমি শিথিল হয়ে আসছে। অনুতোষ প্রায় মরিয়া হয়ে হাঁটতে শুরু করল।

ট্রেনটা মৃদু ঝাঁকনি দিয়ে বোবায় ধরা ঘুমন্ত মানুষের মত একটা বিশ্রী আওয়াজ করে প্লাটফরম ছেড়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। বাইরে মাঠ, গাছগাছালির সার এখন ছায়া ছায়া। অনুতোষ 'ধ্যেৎ' বলে হাতের জ্বলন্ত সিগ্রেটটা সজোরে জানলার বাইরে ছুঁড়ে দিল।

———

নাম বিপিন মুখুটি। আমরা মুখুটি মশাই বলে ডাকতাম। আমাদের নবজীবন কলোনীর তুনম্বর ব্লকের একটা ঘরে থাকতেন। আড়াই কাঠার প্লট। ছোট টিনের দোচালা ঘর। কচার বেড়া, নিচু মেটে ভিত। প্লটটা অবশ্য মুখুটি মশাইর দখলে নয়। ঘরের যিনি মালিক তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও চাকরী করেন। ছেলেপুলে নিয়ে সেখানেই থাকেন। ফলে প্লটটা কলোনী কমিটির হেফাজতে ছিল। কলোনীর সেক্রেটারী ভবতারণবাবু মুখুটি মশাইকে সাময়িকভাবে সেখানে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

তুনম্বর ব্লক কলোনীর শেষপ্রান্তে। মুখুটি মশাই একলা সেখানে থাকেন। ভদ্রলোক বিপত্নীক। শুনেছিলাম তার এক মেয়ে এবং এক ছেলে আছে। তারা কোথায় থাকত সে বিষয়ে মুখুটি মশাইকে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করিনি। অবশ্য পরে তাদের সব খবর জানতে পেরেছিলাম।

সব মিলিয়ে মুখুটি মশাইর ঘরটা নিরিবিলি হওয়ায় আমরা চার বন্ধু প্রায়শ সেখানে আড্ডা বসাতাম। বেশির ভাগদিন তাসের আসর বসত। আমরা যেতাম সন্ধ্যের দিকে। সে সময়টা মুখুটি মশাই কদাচিৎ বাড়িতে থাকতেন। আমরা দিব্বি দরজা খুলে (ঘরের একটা ডুপ্লিকেট চাবি শ্যামলের কাছে ছিল) ধুলোভর্তি চৌকিটা ঝেড়েপুছে গ্যাট হয়ে বসতাম। এক বাণ্ডিল হাতে হাতে ক্ষয়ে আসা ধোঁয়াটে বিবিমার্কা তাস, তুটো বড় সাইজের মোমবাতি আর কয়েক প্যাকেট চারমিনারে সন্ধ্যেটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠত।

মুখুটি মশাই শ্যামলের আবিষ্কার। বেশ মনে আছে একদিন বিকেলের দিকে সবে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেছি এমন সময় ওকে নিয়ে শ্যামল এসে হাজির। প্রথম দিনের আলাপেই ভদ্রলোককে বেশ ভাল লেগে গিয়েছিল। বয়স ষাটের কাছাকাছি। তামাটে রঙ, মুখটা চাঁদা মাছের মত গোল। নিচের পাটিতে একটিও দাঁত না থাকায় ঠোঁটতুটো কিছুটা কোঁচকানো। বুকসমেত

ঘাড় এবং মাথা সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসেছে। বোঝা যায় ভদ্রলোক একদা বেশ লম্বা ছিলেন। মাথা-ভর্তি ঈষৎ লালচে পীতাভ চুল। নাকের ডগা অব্দি চাঁদির চশমাটা ঝুলে এসেছে। কথা বলার সময় নিরন্ত বুক থেকে ঘরঘর করে একটা অদ্ভুত শব্দ কণ্ঠনালী অব্দি উঠে আসে, সম্ভবত মুখুটি মশাইর শ্লেষ্মার ধাত ছিল। প্রত্যেকটি শব্দ চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করতেন, এবং বলতে শুরু করে প্রথমটায় তাঁর চোখের মনি দুটো স্থির হয়ে যেত। তারপর পাতা দুটো বুজে আসত কখন।

সেদিন কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, আপনাগো দশজনের ভরসাতেই এহানে আসা। ভালো অ্যাসোসিয়েশন না হইলে কি বাঁচা যায়। মাঝে-মইধ্যে আপনারা যদি গরীবের ভাঙ্গা ঘরে পায়ের ধূলা ছান—

এধরনের অপ্রত্যাশিত বদান্যতায় আমি রীতিমত লজ্জিত হয়ে বলেছিলাম, না-না সেকি কথা, নিশ্চয়ই যাব। তবে দেখবেন, আমরা যা আড্ডাবাজ, শেষটায় বিরক্ত হয়ে উঠলে চলবে না কিন্তু—

মুখুটি মশাই জিভ কেটে জবাব দিয়েছিলেন—ছি-ছি, এডা কি কথা কইলেন। মানুষের কাছেই তো মানুষ আসে, না কি কয়েন? তা ছাড়া আপনারা হগলেই ভদ্রসন্তান—

সেইথেকে ওঁর বাড়িতে আমাদের আড্ডা জমল। প্রথমদিকে প্রায় প্রত্যেক দিনই যেতাম। সন্ধ্যের সময় গুটি গুটি করে ওঁর ওখানে গিয়ে না বসলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগত। মুখুটি মশাইর মধ্যে আশ্চর্য কিছু গুণ ছিল। খুব সহজে তিনি বয়সের দূরত্ব ঘুচিয়ে আমাদের সঙ্গে মিশতে পারতেন। যে-কোন প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে পারতেন।

মুখুটি মশাইর সঙ্গে পরিচয় হবার কিছুদিন বাদে একদিন পালের বাজারে মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি মুখুটির মশাইর পাশের প্লটে থাকেন। আমাকে দেখেই একগলা অনুযোগ করলেন, খুব তো মশাই আড্ডা মারেন বিপিন বাবুর ঘরে, এদিকে কিভাবে ওর দিন কাটছে খবরটবর রাখেন?

এধরনের কথায় মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, কেন, কি হয়েছে?

—হবে আর কি, ভদ্রলোক তো প্রায়ই উপোস করে কাটান।

আমি সচকিত হয়ে বললাম, সেকি, আমাদের কাছে কখনো এসব তো বলেন নি!

—বলবে কি, লোকটা একটা আস্ত পাগল! কোনো কিছুতে ওর তাপ-উত্তাপ আছে নাকি। যেদিন কিছু জুটলো তো দুটো চাল ফুটিয়ে নিল কোনো রকমে, নইলে সেরেফ জল খেয়েই কাটিয়ে দিল। এই তো সেদিনের কথা, গিন্নী অনেক বলেকয়ে আমাদের বাড়িতে যাহ'ক দুটি খাওয়ানোর জন্যে রাজী করালো, তার আগের দিন নির্জলা উপোস করে কাটিয়েছেন। রান্নাবান্না সব ঠিক-ঠাক, সারাদিনে ভদ্রলোকের পাত্তা নেই। বাড়ি ফিরলেন সেই রাত দশটায়। —আমি খানিকটা দমে গেলাম। খানিকটা অনুশোচনাও হল। সত্যিই তো, বুড়ো মানুষ, বলতে গেলে রোজ ওর ঘরে ঢুঁ মারি, অথচ এসব খবর কখনো নিইনি।

সেদিনই অনেক ঘোরাঘুরি করে একটা টিউশনি জোগাড় করলাম মুখুটি মশাইর জন্যে। মায়নাও মন্দ নয় মাসে পঁচিশ টাকা। যাদবপুরে দুটি ছোট ছেলেকে পড়াতে হবে।

বিকেলের দিকে মুখুটি মশাইর সঙ্গে দেখা, কলোনীর অফিসের পাশের রাস্তাটা দিয়ে হনহন করে ছুটছিলেন। চেঁচিয়ে ডাকলাম। পিছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখে বললেন, আরে দেবেশবাবু যে! কোথায় চললেন?

বললাম, আপনাকেই খোঁজ করছিলাম।

—আমারে? ক্যান, কোনো বিপদ-আপদ হয় নাই তো?

রাস্তার একপাশে ওঁকে টেনে নিয়ে বললাম, এটা কি খুব ভাল হচ্ছে মুখুটি মশাই?

মুখুটি মশাই রীতিমত অবাক হয়ে বললেন, কি হইছে মশায়, কিছু দোষটোষ করছি নাকি?

আমি বেশ খানিকটা গম্ভীর হয়ে বললাম, রোজ আপনার ওখানে যাচ্ছি, রাস্তাঘাটেও দুবেলা দেখা হচ্ছে, অথচ আমাদের কখনো ওসব কথা খুলে বলেন নি।

এবারেও তিনি আমার হেঁয়ালী ধরতে পারলেন না, বেশ ভয়ে ভয়ে বললেন, কি হইছে মশায়, একটু খুইলা কইবেন তো—

আমি ওর কানের কাছে মুখটা বাড়িয়ে ফিসফিস করে বললাম, শুনলাম খুব আর্থিক অসুবিধায় পড়েছেন—

ওর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর নামল। মাথা চুলকে বললেন, যা আক্রার বাজার, তা একটু টানাটানিতে পড়ছি বৈ কি।

আমি ওকে টিউশনির খবরটা দিলাম। ভেবেছিলাম উনি এতে উৎসাহ

দেখাবেন। ওঁর ভাবগতিক দেখে তেমন একটা খুশি হয়েছেন বলে মনে হল না। তবে রাজী হয়ে গেলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, এত তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছেন ?

ধরা গলায় বললেন, ছেলের কাছে।

—ছেলে! আপনার ছেলে আছে নাকি, কোথায় থাকে, কত বড় ? —আমি এ খবরটা জানতাম না।

—বয়স খুব বেশি নয়, পোলাপান মানুষ। বালিগঞ্জে আমার এক জ্ঞাতি ভাই আছে, পয়সায়ালা, নিজের বাড়ি। তার ওখানে থাইকাই পড়াশুনা করে।

আমি বললাম, সে যাহ'ক কালকে সকালে আমাদের বাড়িতে আসুন একবার, ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। দেরী করলে টিউশনিটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে কিন্তু।

মুখুটি মশাই মাথা নাড়িয়ে 'নিশ্চয়ই আমু' বলে হন হন করে চলে গেলেন।

কিছুদিন যেতেই মুখুটি মশাইর নতুন একটি পরিচয় পেলুম। গ্রীষ্মের বন্ধ শুরু হয়ে গেছে। ওর ঘরে আমাদের আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। বিকেল পড়তেই আমরা জড়ো হচ্ছি ওখানে। আমরা চারজন সাকরেদ—আমি, শ্যামল, সতীশ আর জিতুদা। সারাদিন টিপ টিপ করে ছাট বিষ্টি হচ্ছে, থেকে থেকে হাওয়া দিচ্ছে। আমরা নিবু নিবু আলোয় পরপর গোটাকয়েক চারমিনার টানতে টানতে সাত-সতেরো গল্প করে মেজাজটা শানিয়ে নিচ্ছিলাম। তারপর গা-গতর ভাল করে চৌকির ওপর মাদুর বিছিয়ে তাসে সাফল্ দিয়ে নিলাম। নির্ঝঞ্ঝাট রাজত্ব আমাদের। এসময়টা মুখুটি মশাই কোনদিনই ঘরে থাকেন না।

খেলা বেশ জমে উঠেছে। ফাইভ স্পেড-এ ডাবল-রি-ডাবল পড়েছে। আচমকা মুখুটি মশাই এসে ঘরে ঢুকলেন। তারপর সোজা চৌকির ওপর উঠে ছড়ানো তাসগুলো একপাশে সরিয়ে দিয়ে মাঝখানে বসে গদ-গদিয়ে উঠলেন, কি ক্যাবল সারা দিন-রাইত তাস খেলা। পোলাপান মানুষ, এতে হাড়ে ঘুণ ধইরা যাইব যে মশয়। তার থিকা আয়েন একটু গল্পগুজব করি।

সতীশ রীতি মত খেপে উঠল। এমন জমে আসা সন্ধ্যাটা বাজে বকে নষ্ট করতে সে রাজী নয়। প্রায় দাঁতমুখ খিচিয়ে বলল, কিসের গল্প মশায় ?

আমি বললাম, আজকে টিউশনিতে যাননি ?

মুখুটি মশাই আমার দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, আপনার সেই টিউশনি, সেতো গত পরশু ছাইড়া দিছি।

আমি অবাক হলাম। সেকি, অমন ভাল টিউশনিটা ছেড়ে দিলেন!

ফতুয়ার পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে মোম-বাতির আলোয় ধরাতে ধরাতে মুখুটি মশাই বললেন, ভাল না কচু। আরে মশাই রোজ রোজ অভিভাবক আইসা এক ঘণ্টা ধইরা কিভাবে পড়াইতে হইব কেবল যদি সেই উপদেশ ছায় কোন ভদ্দরলোকে তা সইজ্জ করতে পারে? যাউক গিয়া। হ, এইবার কাজের কথায় আহন যাউক। আপনারা পুরাতন পুথিপত্তর পড়ছেন কিছু, এই ধরেন গিয়া আমাগো ছাশের বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল?

আমি উচ্চবাচ্য করলাম না। ভদ্রলোকের উপর আমার দারুণ রাগ হচ্ছিল। চমৎকার টিউশনিটা, অনেক কষ্টে জোগাড করেছিলাম, তুচ্ছ একটা ব্যাপারে এক কথায় ছেড়ে দিল! সতীশ তাসপাগলা ছেলে। ফালতু প্রসঙ্গে জড়িয়ে পডতে রাজী নয়। ও খিচিয়ে উঠল—হ্যা পড়েছি, তাতে হয়েছে কি?

মুখুটি মশাই কিন্তু নির্বিকার। মুখে সেই স্বভাবগত হাসিটি, কন তো কবে ল্যাখা হইছিল এই পুথি?

আমরা এধরনের প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত বোধ করছিলাম। মুখুটি মশাই বিজয়ীর মত দুঠোটের প্রান্তে হাসিটা বিস্তৃত করে দিলেন। আঙুল দিয়ে আধ-পোড়া বিড়ির ছাই ঝেড়ে ফেললেন। বাইরে তখনো টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে তিনি বললেন, পড়ছেন না হাতি! পুথির গোড়াতেই তো আছে, 'সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক।' পদ্ম-পুরাণ পাঠান আমলের লেখা।

জিতুদা মিহিসুরে বললেন, আপনি এসব পড়েছেন বুঝি?

এবার মুখুটি মশাই'র গলার স্বর উত্তেজিত, পড়ছি মানে? কন না মীননাথ গোরক্ষনাথ থিকা রায়মঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, স-ব পড়া আছে।

সতীশ সম্ভবত ভেংচে উঠল, তাই নাকি?

—তবে কি? এসব শিক্ষা আমরা বাপদাদা চৌদ্দ-পুরুষের কাছ থিকা পাইছি। জানেন, এহনো ছাশের বাড়িতে সারা শ্রাবণ মাস ভইরা বেউলার ভাসানের পালা হয়। শোনবেন দুইচাইরডা ছত্তর? —বলেই মুখুটি মশাই আমাদের দিকে দৃকপাত না করে গান ধরলেন—

অমৃত নঞান এড়ি দেবী বিষ নয়ানে চায়।
চন্দ্রসূর্য সবে গিয়া আভেতে লুকায়।—

গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলাম এককালে মুখুটি মশাইর গানে সুর ছিল। তিনি গান থামিয়ে বললেন, এ ছত্তরগুলো অবশ্য বিজয় গুপ্তের লেখা না। ল্যাখছেন কানাহরি দত্ত। কালসাপের দাপটের কথা বলা হইছে। —তারপর হেসে মাথা চুলকে ফের বললেন, তবে শুনবেন নাকি ?

জিতুদা বললেন, কি ?

—ছোড বয়স থিকাই নাটক ল্যাখার একডু-আধডু বাতিক আছে। ঘ্যাশের বাড়িতে আমার ল্যাখা দুচাইর-খান নাটক প্লে-ও হইছিল। যদি আপনাগো আপত্তি না থাকে তো শোনাইতে পারি।

জিতুদা নাটকের ব্যাপারে বরাবরই উৎসাহী। দুর্গা-পুজো কালীপুজোয় কলোনীতে যেসব নাটক হয় তার পাণ্ডা। তিনি দ্রুতগতিতে আমাদের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে বললেন, না-না, আপত্তি কিসের। কি বলিস তোরা ?

অগত্যা আমরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। যদিও মনে মনে ভীষণ রেগে উঠেছিলাম।

মুখুটি মশাই তড়িতে নিচে নেমে খাটের তলার ভাঙা কাঠের বাক্সটা থেকে একরাশ ছেড়াখোড়া কাগজ বের করে ফের চৌকিতে এসে বসলেন, তারপর কাগজ গুলোকে ভাজ করে আলতো করে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন। এডা শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপরে ল্যাখা।—তারপর কয়েক পাতা উল্টাতে উল্টাতে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা কন তো দেবেশবাবু, মহাপ্রভুর মৃত্যু হইছিল কিভাবে ?

আমি চট করে জবাব দিলুম, কেন, পুরীতে, সাগরে ঝাঁপ দিয়ে।

মুখুটি মশাই ফের তেম্নি করে একটু চাপা হাসি ঠোঁটের কোনায় তুলে বললেন—আরে, ওসব তো পুরোনো কথা, হগলডিই জানে। ওতে আমার কিন্তু বিশ্বাস হয়না। অতবড একজন মহাপুরুষ, বলা নাই কওয়া নাই শেষে জলে ডুইব্বা আত্মহত্যা করবেন কোন্ দুঃখে। আইচ্ছা, আপনারা কেউ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল পড়ছেন ?

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। মুখুটি মশাই সম্ভবত আমাদের মনের ভাবটা ধরে ফেললেন। বল্লেন, তাইলে শোনেন, মহাপ্রভু তখন নবদ্বীপে দিনরাত সাঙ্গপাঙ্গ লইয়া রাস্তায় রাস্তায় নামকীর্তন করত্যাছেন। একদিন হঠাৎ রাস্তা দিয়া চলবার সময় পায়ে ফুটলো ছোট একটুকরা ইটের কুচি। সেই থিকা হইল ঘা, যারে আপনারা আইজকাইল সেপটিক কন তাই। সেই-ই হইল মহাপ্রভুর কাল। হাজার হইলেও তিনি মনুষ্য জন্ম ধারণ করছিলেন তো, তাই মরলেনও মানুষের মতই। পইড়া দেইখেন, সব কথা আছে জয়ানন্দের পুঁথিতে।

—এই বলে তিনি চোখ বুজলেন। মৃদু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে নাটক পড়তে শুরু করলেন। পুরো তিন ঘণ্টা ধরে নাটক শোনালেন। শুধু তাই নয়। মাঝে মাঝে আবার মাষ্টারী চালে ব্যাখ্যা এবং ইতস্তত: প্রশ্ন। কি অসহ্য বিরক্তিকর—বলে বোঝানো যাবে না। শেষের দিকে শ্যামলের মাথায় খুন চেপে গেল। জোর করে, অনেকটা অভদ্রের মত ওকে ধমকে থামিয়ে দিল। মুখুটি মশাইর ঘর থেকে আমরা যখন রাস্তায় নেমে এলুম তখন রাত এগারটা।

সেই থেকে মুখুটি মশাইর পাগলামি শুরু হয়েছিল। আমাদের সন্ধ্যের আড্ডাটা দিনে দিনে ভয়াবহ হয়ে উঠল। সারাদিন ভদ্রলোকের পাত্তা নেই, ঠিক সন্ধ্যের সময় যখন সবে ওর ঘরে জমেছি হঠাৎ কোত্থেকে মূর্তিমান উৎপাতের মত এসে হাজির! তারপর একটানা রাত দশটা অব্দি নাটক শোনানো। সিরাজউদ্দৌল্লা থেকে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কিত শৈলবালার বিয়ে পর্যন্ত অজস্র অপাঠ্য সেকালে নাটক। আমরা চারটি নিরীহ প্রাণী সেই নাটকের পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে পড়তুম। কোনো কোনো দিন কটু কথাও যে বলিনি এমন নয়, কিন্তু কে কার কথা শোনে! আমাদের ধমকানি বরঞ্চ ওর উৎসাহ বাড়িয়েই তুলতো। শেষটায় আমাদের সব রাগ গিয়ে পড়ল জিতুদার ওপর। বস্তুত, নাটুকে জিতুদাই ওঁর পাগলামির ইন্ধন যোগাত। এসব নিয়ে জিতুদাকে আড়ালে-আবডালে কিছু বললেই তিনি ক্ষেপে উঠতেন। ভেংচে বলতেন, যত দোষ সব নন্দ ঘোষের, না? নাটক কি কেবল আমিই শুনি, তোরা শুনিস না? ভাল না লাগে পষ্টাপষ্টি তোরা বললেই তো পারিস। —একথার কোন জবাব দেওয়া চলে না। অগত্যা আমরা মুখুটি মশাইর বাড়িতে আড্ডা দেওয়া ছেড়ে দিলাম। আগের মত আবার ঝিলের পাড়ে বিকেলের খোস মজলিশটা সেরে নিতাম।

কিন্তু এতেও মুখুটিমশাইর হাত থেকে নিস্তার পাইনি। এরপর থেকে তিনি আমাদের বাড়ি বাড়ি ঢুঁ দিতে লাগলেন। ভদ্রলোক যেন ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আমাদের সকালগুলো আর নিরুপদ্রবে কাটত না। ধূমকেতুর মত হুট করে হানা দিতেন। ঘরে ঢুকে চেয়ার জুড়ে বসে একলাই বকবক করে যেতেন। সকালের পড়াশুনো শিকেয় উঠত। শুধু নাটক নয়। তৎসহ তার আলোচ্য বিষয় ছিল বহুবিধ।

দেশের বাড়িতে ক'টা পুকুর, ক'টা নাটমন্দির বা ক'কাঠা ধানি জমি ছিল, কবে কোথায় ব্যবসা করতে গিয়ে এক কাঁড়ি টাকা জলে দিয়েছিলেন, স্বদেশী

আমলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কিভাবে মাঘমাসের শীতে নদী সাঁতরে বোমা পিস্তল চালান দিতেন ইত্যাদি ফালতু গল্পগুজবে আমার সকালবেলার পড়াশুনা মাটি করে দিতেন। এমন কি, বাবা পর্যন্ত ওর ওপর চটে গিয়েছিলেন। বুড়োমানুষ, মুখের ওপর কিছু বলতেও পারতেন না। কখনো আমি সাতরকম কাজের অজুহাত দেখিয়ে ওকে হটিয়ে দিতাম। কখনো বা ভোরবেলা পাশের কোন বাড়িতে বই খাতা নিয়ে পালিয়ে যেতাম। বেশ কয়েক দিন আমাকে না পেয়ে তিনি আসা ছেড়ে দিলেন। আমিও হাপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সামনে বার্ষিক পরীক্ষা। শ্যামল আর আমি বাড়িতে বসে ইকনমিক্সের বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি, হঠাৎ জিতুদা আর সতীশ এসে হাজির। আমরা সচকিত হয়ে বললাম, ব্যাপার কি, এ অসময়ে যে!—জিতুদা হাঁপাচ্ছিলেন, একটু থেমে ফিসফিসিয়ে বললেন. ব্যাপার আর কি, এবার ঠ্যালা সামলাও। তোমাদের পিরিতের মুখুটিমশাই আবার এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছেন।—এই বলেই জিতুদা বেরিয়ে গেলেন। আমরা দুজনে সতীশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। একটু পরেই জিতুদা একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক এবং একটি দশ-বারো বছরের ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে চেয়ারে বসতে বললুম। জিতুদা বললেন, ভদ্রলোক বালিগঞ্জ থেকে আসছেন, মুখুটিমশাইর ভাইপো। আর এটি মুখুটি মশাইর ছেলে।—ছেলেটির দিকে তাকালাম। শ্যামলা গড়ন, রোগাটে, চোখদুট বেশ ঢলঢলে। ভদ্রলোক বললেন, কাকাবাবুর জ্বালায় বাড়িসুদ্ধ সবাই হাঁপিয়ে উঠেছি। রোজ সকালবেলা আমাদের বাড়িতে যাবেন, বাবাকে এটা দাও ওটা দাও বলে জ্বালাতন করবেন, বউদের অ্যাডভাইস দেবেন। বাবা ভাল ভেবেই পল্টুকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। কাকাবাবু যা বাউণ্ডুলে, তবু ছেলেটা যদি আমাদের ওখানে থেকে পড়াশুনা করে মানুষ হয়। অনেক হয়েছে, এবার যার ছেলে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পারলেই বাঁচি।—

আমরা থ বনে গেলাম। এ সময় মুখুটিমশাইকে সামনে পেলে হয়ত ওঁকে ছিঁড়ে ফেলতাম। কিন্তু এখন উপায়ই বা কি। মুখুটিমশাইর নিজের যা অবস্থা। তার ওপর ছেলেটি ঘাড়ে এসে চাপলে আর কথা নেই! আমাদের মধ্যে শ্যামল খানিকটা চটপটে। ও বললে, দেখুন, মুখুটি মশাই'র সব

কিছু তো আপনারা ভাল করেই জানেন। একে নিজেরই চলে না। তার ওপর ছেলেটিকে এখানে রেখে গেলে ও না খেতে পেয়েই মারা যাবে! এতদিন ওর জন্য আপনারা করে এসেছেন। আর দুটো দিন দেখুন, আমরা কথা দিচ্ছি, সবাই মিলে ওকে বুঝিয়ে বলব এখন।—আমরা সকলে শ্যামলের কথায় সায় দিয়ে অনেক করে বুঝিয়ে বলতে ভদ্রলোক নিমরাজী হয়ে গেলেন। যাবার সময় বললেন, আপনারা সকলে যখন বলছেন এবারের মত ওকে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু দেখবেন, ফারদার যদি কা্গবাবু আমাদের ওখানে গিয়ে ডিস্টাব করেন তাহলে—

আমরা ভদ্রলোককে কথা দিয়েছিলাম। মুখুটিমশাইও আর কোনদিন ওদের বাড়ি মাড়ান নি।

আমরা সবাই মিলে মুখুটি মশাইর একটা হিল্লে করে দিলাম। কলোনীর ডাক্তার রামকৃষ্ণবাবুর ডিস্পেন্সারী পালের বাজারে। দুবেলা ডিস্পেন্সারীতে বসতে হবে, রোগীপত্তরের তদারকি করতে হবে। রামকৃষ্ণবাবুর বাড়িতেই মুখুটিমশাই খাবেন। বুড়োমানুষ, নিজের হাতে রান্না-বান্না করা ওর এখন আর পোষায় না। তাছাড়া পানটা বিড়িটার জন্যে কিছু হাত খরচও মিলবে।

কিছুদিন না যেতেই ফের মুখুটি মশাই একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুললেন। সতীশের মুখে খবরটা শুনলাম। ডিস্পেন্সারীর কাজ, রোগীপত্তর আসছে, সবসময় একজন না থাকলে চলেনা। মুখুটিমশাই দুদিন যান তো তিনদিন যান না। তার ওপর কথায় কথায় রামকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে তর্ক জুড়ে বসেন। রামকৃষ্ণবাবু শেষপর্যন্ত জবাব দিয়ে দিয়েছেন। রীতিমত হাঁপিয়ে উঠলাম মুখুটি মশাইকে নিয়ে। মনে মনে কামনা করলুম লোকটা কলোনী ছেড়ে চলে গেলে বাঁচি।

পরের দিন মুখুটি মশাই আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই বকবক করতে লাগলেন। আমি কোন কথা বললাম না, রাগে আমার হাত দুটো নিসপিস করছিলো। শেষটাতে নিজেই বললেন, কি যে চাকরী দিছিলেন আপনারা, বুড়া হাড়ে অত খাটনি সহ্য হয় কখনো।

আমি নির্বিকার কণ্ঠে বললাম, এবার তাহলে কি করবেন? টিউশনি, চাকরী—দুটোই তো গেল।

ধোঁয়াটে চশমার ফাঁক দিয়ে পিটপিট করে তাকালেন মুখুটিমশাই

তারপর চশমটা খুলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছতে লাগলেন। কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে তার চোখের মণিদুটো স্থির হয়ে এল, তারপর পাতাদুটো অর্ধেক বুজে এল। ছোট করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, ঠিক করছি মাইয়ার কাছে যামু। ও একলা পইড়া আছে, গেলে খুব খুশি হইব।

আমি চমকে উঠলাম—মেয়ে! আপনার মেয়ে আছে নাকি?

উনি বললেন, আছে এক মাইয়া। বনগায় নার্সগিরি করে। বয়স হইছে, বিয়া দিতে পারি নাই। নিজেই খুইজ্জা পাইত্তা চাকরীটা জোগাড় করছে।—

আমি আর কথা বাড়ালাম না। মনে মনে ভাবলাম, সেই ভাল। মেয়ের কাছে গেলে যদি মুখুটিমশাই'র দুঃখ ঘোচে।

সেদিন বিকেলের ট্রেনে বনগাঁ রওনা হলেন মুখুটি মশাই। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বহুদিন বাদে আবার ওঁর ঘরে আমাদের সান্ধ্য আড্ডাটা বেশ জমে উঠল।

কিন্তু অত সুখ মুখুটিমশাইর সইল না। এক সপ্তাহ না ঘুরতেই ফিরে এলেন। আমরা ওঁর ঘরে বসে তাস খেলছি, রাত আটটা হবে, হঠাৎ দেখি মুখুটিমশাই এসে হাজির।

আমাদের যেন সাপে কামড়াল। বললাম, ব্যাপার কি, হঠাৎ চলে এলেন যে!—জামা খুলে ঝোলানো দড়িতে রাখতে রাখতে মুখুটিমশাই বললেন, আর কন ক্যান। আইজকালকার মাইয়া কি মানে বাপ-মায়েরে? কেবল বাইরফুড়ানি। এদিকে বুড়াবাপ বাচুক কি মরুক তাতে আসে যায় কি তাগো।

সতীশ মুচকি হাসল। তাহলে মেয়ের ভাতও ঘুচলো বলুন!

মুখুটিমশাই চৌকির ওপর উঠে এলেন। আমাদের ঠেলেঠুলে মাঝখানটা দখল করে মোমবাতির আলোয় একটা বিড়ি ধরিয়ে ফুকফুক করে দুটো টান দিয়ে খানিকক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। তারপর ঈষৎ রাগতস্বরে সতীশের কথার জবাব দিলেন, মাইয়ার ভাত ঘুচলো মানে, আমি নিজেই চইল্লা আইছি। অমন মাইয়ার মন যোগাইয়া চলা আমার কম্ম না। —এই বলে ফের বিড়িতে দুটো টান দিয়ে গলার স্বর খানিকটা খাদে নামিয়ে বললেন, "তা আপনাগো খবর কি, সব ভাল তো? আপনারা হগলেই আছেন, ভালই হইল, অনেক কথা আছে।"

আমি আর শ্যামল ততক্ষণে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। সতীশও ওপাশ থেকে উঠে এল। মুখুটি মশাই খানিকটা অবাক হয়ে জিতুদার কাঁধে

হাত রেখে বললেন, ব্যাপারডা কি ? এহনই সব চললেন কোথায় ? বহেন না আর একটু।—

জিতুদাও এক ঝটকায় মুখুটিমশাই'র বেষ্টনীমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফেটে পড়লেন, "আপনার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি মশাই, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। ফের কোনদিন আর আমাদের জ্বালাতন করবেন না বলে দিচ্ছি।

আমরা চারজন হনহন করে ঘর ছেড়ে উঠোন, উঠোন ছেড়ে বড় রাস্তায় চলে এলুম। মুখুটিমশাই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, এডা কি ভাল হইল মশাইরা। একটা কথা শুইনা গেলে পারতেন না।—

শ্যামল বিড়বিড় করে উঠল : স্টুপিড্‌!

সেই মুখুটিমশাই মারা গেলেন। হঠাৎ, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে সবে ঘরে পা দিয়েছি, অমনি মা খবরটা দিল। প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। শুনলাম, বেলা দশটা নাগাৎ মুখুটি মশাই মারা গেছেন। এর মধ্যে কবে নাকি রাস্তায় আ'ছাড় খেয়েছিলেন। তারপর দুদিন ধরে জ্বর। হঠাৎ হার্টফেল করেছেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। গিয়ে দেখি বেশ ভিড জমেছে। মুখুটিমশাইকে উঠোনে এনে রাখা হয়েছে। কলোনীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নানান জায়গা থেকে অনেকগুলো টগর, কাঞ্চন, সূর্যমুখী ফুল নিয়ে এসেছে। ওরা খাটের চারপাশে থরে থরে ফুলগুলি সাজিয়ে দিচ্ছে। একপাশে কলোনীর সেক্রেটারী ভবতারণবাবু দাঁড়িয়ে। মাথার কাছে শ্যামল, সতীশ আর জিতুদা।

জিতুদা আমাকে ইশারা করে ডাকলেন। ওদের দিকে এগিয়ে যেতেই ফিসফিস করে বললেন, তোর জন্যেই অপেক্ষা করছি, মরেছেন সেই বেলা দশটায়।—

আমি কোন কথা বললাম না। মুখুটিমশাই'র মৃতদেহের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। দেখলাম, ওর চোখের মণিদুটো আশ্চর্য স্থির, পাতাদুটো আধবোঁজা। আর ঠোঁটের দুপাশে বিস্তৃত সেই অদ্ভুত দৃপ্ত হাসিটুকু। মনে হল, মুখুটি মশাই যেন কোন একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন। ভবতারণবাবু বললেন, ভদ্রলোকের আত্মীয়স্বজন কেউ আছে কি, আপনারা জানেন কিছু ?—সতীশ বললে, হ্যাঁ, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে আছে। মেয়ে বনগাঁয় কোন এক হাসপাতালের নার্স। ছেলেটি বালিগঞ্জে মুখুটি মশাই'র এক আত্মীয়ের কাছে থাকে। কিন্তু, ওদের ঠিকানা তো আমরা জানি না।

শ্যামল বললে, ঘরের বাক্সটাক্সগুলো একবার খুঁজে দেখলে হয় না।—

ভবতারণবাবু বললেন, কাইগুলি একবার দেখুন না। বড্ড দেরী হয়ে গেল।—

আমরা চারজন ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। সেই ঘর। একটা কাঠাল কাঠের চৌকি, তাতে অপরিচ্ছন্ন একটা তুলোওঠা তোষক, তেলজবজবে দুটো বালিশ, কোনায় একটা ছোট্ট তোলা উনুন, একটা কুঞ্জো, দুচারখানা এনামেলের বাসন, মেটে হাঁড়ি একটা। বালিশ উল্টে তোষকটা তুলে দেখলাম। কিছু পাওয়া গেলনা। ঝোলানো দড়ি থেকে সার্টটা নামিয়ে পকেট হাতড়ালাম। দুটো ট্রামের টিকিট, কিছু খুচরো পয়সা, গোটা দুয়েক বিড়ি পাওয়া গেল। চৌকির নিচ থেকে আলকাতরা মাখানো ভাঙা কাঠের বাক্সটা টেনে বের করলাম। চারজনে মিলে তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। আশ্চর্য, একটা চিঠি বা একটুকরো চিরকুট পর্যন্ত পাওয়া গেল না। বাক্সভর্তি খানকয়েক ছেঁড়া কাপড়, রাশি রাশি নাটকের পাণ্ডুলিপি—যার প্রায় সবকটাই আমরা শুনেছি। একটা পোকায় কাটা সাবেকি আমলের শাল, আর সেই শালের ভাঁজে সযত্নে রাখা একখানা ফটো। ফটোটা মুখুটিমশাই'র যুবক বয়সের। সঙ্গে পুরোনো ঢঙে সেজেগুজে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। সম্ভবত, উনি মুখুটিমশাই'র স্ত্রী। বহুদিন আগেকার খসখসে ব্রোমাইড কাগজে তোলা বলে ফটোটা ঝাপসা। তবু মুখুটিমশাইকে চিনতে কষ্ট হলনা। বিরাট লম্বা দশাসই যুবক, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, স্থির উজ্জ্বল চোখের মণি, পাতা দুটো আধবোঁজা, ঠোঁটের কোণে বিস্তৃত সেই চাঁপা হাসিটি।

ভবতারণবাবু বললেন, মিছিমিছি আর দেরী করে লাভ নেই। ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

আমরা চারজন—আমি, শ্যামল, সতীশ আর জিতুদা খাটটা কাঁধে তুলে নিলাম। জিতুদা একবার নিম্নস্বরে বলে উঠলেন, বলো হরি, হরি-বোল।

আমরা খুব আস্তে আস্তে ওর সঙ্গে গলা মেলালাম।

উঠোন ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছি। শীতের সন্ধ্যা, চাপচাপ কুয়াশা নামছে চারদিকে। রাস্তার পাশে একটা বাড়ির কাছে পেয়ারা গাছতলায় একদল বউ জড়ো হয়ে আমাদের দেখছিল।

ওদের মধ্যে কে একজন চাপাগলায় বলে উঠল—আহা, বুড়োটা মারা গেল! খুব ভাল লোক ছিল কিন্তু।

মুখুটিমশাইর মৃতদেহটা খুব হাল্কা লাগছে। আমরা জোরে পা চালিয়ে ছ'নম্বর ব্লক ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম।

॥ স্মৃতির জানালা ॥

ঘুম ভাঙতেই সরমা দেখলেন দক্ষিণের জানালা গলে একফালি রোদ পায়ের কাছটায় ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি হাত দিয়ে গায়ে জড়ানো সুজনীটা একপাশে সরিয়ে দিলেন। দূরে বড় রাস্তাটা শীতের পীতাভ রোদে নিঃঝুম। রাস্তার ওপাশের পাহাড়টা গুটিসুটি মেরে পড়ে রয়েছে ঘননীল আকাশের নিচে। অল্প অল্প বাতাসে ঘোড়ানিম গাছের পাতাগুলো শিরশির করে কাঁপছে। গাছটার ডালপালার মধ্য দিয়ে গীর্জার চুড়োটা দেখা যাচ্ছে।

ঢং ঢং করে দেওয়াল ঘড়িতে দুটো বাজল। সরমা সেদিকে চোখ ফেরালেন। ছুটির দিন, তবু সারাটা সকাল একটানা খাটতে হয়েছে। লছমীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করেছেন। খাট টেবিল চেয়ার আলমারী ঝাড়-পোছ করা হয়েছে। তারপর গেছেন রান্না ঘরে। আঁটো করে কোমরে কাপড় গুঁজে রান্না করেছেন কত কি! বারোটা নাগাৎ দুটো মুখে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খেয়াল নেই।

সরমা শিথিল হাতে শাড়ির আঁচলটা বুকে তুলে নিলেন। পা দুটো ভাঁজ করে শরীরটা গুটোলেন। তারপর উঠে বসলেন। পায়ে পায়ে চলে এলেন টেবিলের কাছে। হাত পা বাহুমূল এমনকি চোখের পাতা দুটো পর্যন্ত ভার ভার। টেবিলের ওপর জড়ো করা রয়েছে পরীক্ষার খাতা খান কয়েক স্কুলপাঠ্য বই, চশমা ইত্যাদি। সরমা আলতো করে চশমাটা তুলে নিলেন। কাপড়ের আঁচল দিয়ে সেটাকে মুছে নিলেন ভাল করে। সিলিণ্ড্রিক্যাল চশমা, অস্বাভাবিক পুরু লেন্স। স্কুলের মেয়েদের পরিভাষায় এর নাম বড়দিদিমণির ঠুলি।

সরমা চশমাটা নাকে গলিয়ে নিয়ে দেরাজটা খুললেন। দেরাজ ভর্তি একগাদা জিনিসপত্র। প্রথমেই চোখ পড়ল ভাইপো রবির জন্যে তৈরী সোয়েটারটায়। অনেক যত্নে বহুদিনের শ্রমে এটা তিনি তৈরী করছেন। সোয়েটারের নিচে কয়েকটা মনিঅর্ডারের স্লিপ। ছোট ভাই তরুণ ইঞ্জিনিয়ারীং

পড়ছে। তাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হয়। রিটার্ণ স্লিপগুলো সরাতেই বেরিয়ে পড়ল পোস্টঅফিসের পাশ-বইটা। ছোট বোন কমলার বিয়ের জন্যে তিনি কিছু কিছু সঞ্চয় করেছেন। একা অরুণের পক্ষে সব চালানো সম্ভব নয়। কলকাতায় তার মস্ত বড় সংসার; সে নিজে, বউ, দুটি ছেলেমেয়ে—রবি-ছবি, তাছাড়া তরুণ-কমলা। সরমা ঠিক করেছেন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেলেই একটা ভালো পাত্র দেখে কমলার বিয়ে দেবেন। মেয়েদের বিষয়ে তিনি একটু গোঁড়া। তাঁর ধারণায় মেয়েদের জীবনে কাজ দুটি। এক, যথাশীঘ্র বিয়ে হয়ে যাওয়া। দুই, স্বামীর ঘরে গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার করা। এছাড়া আর কিছু মহৎ কাজ মেয়েদের করার আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। হয়ত মেয়েরাও এর বেশী কিছু চায়না।

দেওয়ালঘড়িটা টিক টিক করে বেজে চলেছে অনবরত। সরমা জিনিসগুলো সাজিয়ে দেরাজটা বন্ধ করে দিলেন। শীতের প্রলম্বিত রোদ ততক্ষণে খাট ছাড়িয়ে মেঝেয় নেমে এসেছে। ঘোড়ানিম গাছের হাওয়া-সিরসির পাতার ছায়া লুটোপুটি খাচ্ছে মেঝেতে।

মাইজী—

সরমা চোখ ফেরালেন। লছমী এসে দাঁড়িয়েছে দরজা ঘেঁসে। সরমা লছমীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে খুশী হলেন। লছমীর গায়ে একটা খয়েরী রঙের শাড়ি। ভাসাভাসা চোখ, কপালে একটা কাঁচপোকার টিপ। সরমা বললেন, যা উনুনটা ধরিয়ে তাড়াতাড়ি এক প্যান জল বসিয়ে দে। ও হয়ত এসেই হটবাথ করতে চাইবে।

সরমা 'ও' শব্দটা একটু জোর দিয়ে বলেই লজ্জা পেলেন। লছমী চলে গেলে তিনি খাটের কাছে এগিয়ে এলেন। জাজিমের তলা থেকে চিঠিটা বের করলেন। সকাল থেকে অনেকবার চিঠিটা পড়ে ফেলেছেন। তিনি চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চিঠিটা খুললেন। 'কল্যাণীয়া সরমা', সরমা মুচকি হাসলেন। 'কল্যাণীয়া' যেন কোন এক গুরুজন ব্যক্তি চিঠি লিখছেন! 'অনেকদিন বাদে তোমার কাছে চিঠি লিখছি।' অনেকদিন, হ্যাঁ, তাতো প্রায় পনের বছর হবেই। শেষ দেখা হয়েছিল একদিন সন্ধ্যায়, হগমার্কেটে। কৃষ্ণনাথ মার্কেটিং করতে এসেছিল। সঙ্গে ছিল বউ, তার কোলে একটা ছোট মেয়ে।—'একটা কনস্ট্রাক্সনের কাজে ঝাড়গ্রাম যাচ্ছি শনিবার। একদিন তোমার কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম যে তুমি ঘাটশীলায় আছ। রবিবার তোমার ওখানে যাব। আশা করি থাকবে।' 'আশা করি' কেন?

কি বলতে চায় কৃষ্ণনাথ? তার চিঠি পেয়েও কি সরমা থাকতেন না! অক্ষর-গুলো সরু পিনের ডগার মতো তার চোখে বিঁধতে লাগল। এ যেন স্কুলের সেক্রেটারী হরিহরবাবুর চিঠি, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু অ্যাটেণ্ড দ্য মিটিং। আশ্চর্য, এতদিনে গুছিয়ে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে শেখেনি কৃষ্ণনাথ। তার লেখা উচিত ছিল, রবিবার তোমার ওখানে যাচ্ছি, ওই সময় অবশ্যই তুমি বাড়িতে থাকবে। চিঠির অধোনামায় কয়েকটি গুটি গুটি অক্ষর, 'ইতি কৃষ্ণনাথ'। সরমা ছোট করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন। যাক্, তবু শেষটা বজায় রেখেছে। অন্তত নিজের নাম স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ফলিয়ে লেখেনি, ইতি—শ্রীকৃষ্ণনাথ বসু।

বাইরে সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজ শোনা গেল। সরমা তাড়াতাড়ি চিঠিটা খামে পুরে জাজিমের তলায় রাখলেন। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে এলেন। ব্রীজমোহন ততক্ষণে সাইকেলটা বারান্দার থামে হেলিয়ে দিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। তার পরনে খাঁকির সার্টপ্যাণ্ট। বুকে ঝোলানো আয়তকায় চকচকে একটা চাকতি। তাতে খোদাই করা রয়েছে, গ্রেহাম্‌স্ মিশনারী স্কুল ফর গার্লস। ব্রীজমোহন বলল, তিনটের সময় আসতে বলেছিলেন বড়দিদিমণি। সরমা জবাব দিলেন,—হুঁ, তোকে একবার স্টেশনে যেতে হবে, ঝাড়গ্রাম থেকে এক ভদ্রলোকে আসবেন সাড়ে তিনটার ট্রেণে।—বলতে বলতে সরমা হঠাৎ থমকে গেলেন। কৃষ্ণনাথের চেহারার কি বর্ণনা দেবেন তিনি। দশাসই মানুষ, বিশাল চওড়া বুক, সুপুষ্ট লোমশ হাত, পুরো ছ'ফুট লম্বা। মাজা সোনার মত টকটকে রঙ, চোয়ালের ঠিক নিচে একটা কাটা দাগ। ছোট বয়সে সিড়ি থেকে পড়ে কেটে গিয়েছিল। দাগটা তেঁতুলবিছের মত লম্বা, চেরাচেরা। হাসলে কাটা দাগটায় টান পড়ে। তখন ভারী সুন্দর দেখায়, মনে হয় একটা ফড়িং যেন ডানা মেলে উঠতে চাইছে।—ব্রীজমোহনের দিকে চোখ পড়তেই তিনি সপ্রতিভ হলেন। বললেন, ভদ্রলোকের বয়স বছর পঞ্চাশেক হবে। আমার নাম করে বলবি, দিদিমণি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ব্রীজমোহন ঘন্টি বাজিয়ে চলে গেল। সরমা বারান্দার থামে পিঠ হেলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উঠানে একফালি রোদ, নরম এবং গাছের ছায়ায় চিত্রিত। সরমার বুকের ভেতরটা তির তির করে উঠলো। তিনি একটা হাই তুললেন।

পেয়ারা গাছের একটা শুকনো পাতা খসে পায়ের কাছে পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। চট করে কাপড়ের আঁচল দিয়ে কাঁধটা ঢেকে ঘরে চলে গেলেন। আলনা থেকে একটা শাড়ি তুলে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন।

ভেতরে ঢুকে ভালো করে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। একটানে হেয়ার পিনটা খুলে দিতেই একরাশ চুল কোমর ছাপিয়ে পিঠে পড়লো। সরমা হাতের আঙুল-গুলো বিস্তৃত করে চুলের মধ্যে মিশিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর হ্যাংগার থেকে চিরণীটা টেনে নিয়ে চুল বাঁধলেন। আজ কুড়ি বছর ধরে একই ছাঁদে চুল বেঁধে আসছেন তিনি। সাদামাটা বাহুল্যহীন। চুলের অযত্নের জন্য বান্ধবীদের কাছে কম কথা শুনতে হয়নি। যে রাঁধে সে চুল বাঁধে। কিন্তু, যাকে আজ কুড়ি বছর ধরে, ইউনিভারসিটি থেকে বেরোতে না বেরোতেই বাবার মৃত্যুর পর সংসারের জোয়াল কাঁধে নিতে হয়েছিল, তার কাছে এ যুক্তি নিতান্তই হাস্যকর। চুল বাঁধা কেন, একে একে সবকিছু তাকে ছাড়তে হয়েছিল। কেশচর্চা, গান, কবিতালেখা, এমনকি কৃষ্ণনাথের সঙ্গ পর্যন্ত।

সরমা চোখেমুখে আঁজলা ভরে জল ছিটিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। সেই চোখ, সেই মুখের সু ডৌল রূপরেখা। আশ্চর্য, এমনকি ঠোঁটের নিচের ছোট তিলটি পর্যন্ত। সরমা ঘসা আয়নার কাঁচে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। একটা ধূসর ম্লান সুখস্মৃতি। তাঁর ঠোঁটদুটো অকারণে কেঁপে কেঁপে উঠল।

মাইজী, মাইজী—বাইরে লছমীর চাপা গলার আওয়াজ।

কি?

বাবুসাব এসে গেছেন।

ঘরে নিয়ে বসা, আমি এক্ষুনি আসছি।

সরমা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাথরুম থেকে। বাইরে বেরিয়েই দেখেন, কৃষ্ণনাথ উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণনাথের শরীরের পিছনের অংশটা দেখা যাচ্ছে। গায়ে ঘাসরঙের একটা বুশসার্ট, পরনে দামী কাপড়ের ফুলপ্যান্ট, মাথায় শোলার হ্যাট। সঙ্গে একটি আট-দশ বছরের ছেলে।

সরমা বারান্দা থেকে নেমে উঠানে এসে কৃষ্ণনাথের সামনে দাঁড়িয়ে সহজভঙ্গীতে বললেন, 'একি! বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরে এসো।'

কৃষ্ণনাথ চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। সে বললো, বাঃ! চমৎকার জায়গাটিতো।

আগের তুলনায় চেহারায় তেমন কিছু বদলায়নি সে। তেম্নি সতেজ দৃপ্ত ভঙ্গী। চিবুকের নিচের দাগটাও স্পষ্ট। তবে টিকালো নাকটা যেন একটু ভোঁতা, আর ভুরুতে ইতস্ততঃ গোটাকয়েক পাকা চুল।

সরমা একটু হেসে পাশের ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'কি নাম তোমার ?'

'শ্রীবিদ্যুৎকুমার বসু'—মিষ্টি গলায় বললো।

কৃষ্ণনাথ বলল, 'খোকন, মাসিমাকে প্রণাম কর।'

বিদ্যুৎ মাথা নিচু করে প্রণাম করতে যেতেই সরমা ওকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, থাক্ থাক্ তারপর 'বিদ্যুৎ, কোন্ ক্লাসে পড় ?'

—ক্লাস ফোর।

ফোর! বাব্বা, তাহলে তো বেশ বড় হয়ে গেছ দেখছি—বলেই সরমা কৃষ্ণনাথের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

কৃষ্ণনাথ বলল, আর বোলোনা, এ ছেলেকে নিয়ে হয়েছে এক ঝামেলা। কিছুতেই বাড়িতে থাকবে না। আমি যেখানে যাব, ও ঠিক পিছু নেবে। এত করে বললো ওর মা—

ওরা বারান্দায় উঠে এল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সরমা বললেন, ভালই হল। তবু এই সুযোগে ওকে তো দেখতে পেলাম।

ঘরে ঢুকে কৃষ্ণনাথ ডেকচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিল। বিদ্যুৎ ততক্ষণে সরমার বেষ্টনীমুক্ত হয়ে ঝোলানো কাঠের তেপায়ায় রাখা রবীন্দ্রনাথের মাটির মূর্তিটার সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখছে। সরমা টেবিলের কাছে এসে চশমাটা খুলে রাখতে রাখতে বললেন, হটবাথ করবে ?

হটবাথ ?—কৃষ্ণনাথ তার কথাটাকে যেন বিদ্রূপ করে বলে উঠল, নো, আই অ্যাম নট এন্ ওল্ড হ্যাগার্ড ইয়েট। এই সামান্য শীতে সেঁদিয়ে যাবার মত অশক্ত হইনি এখনও।

সরমা খাটের পাশ থেকে গোল টেবিলটা টেনে ডেকচেয়ারের সামনে এনে হেসে বললেন, অতটা বীরত্ব ভালো নয়। কার্তিকের ঠাণ্ডা বুকে বসে গেলে চট করে একটা কিছু হয়ে যেতে কতক্ষণ।

কৃষ্ণনাথ চেঁচিয়ে উঠল: এ-ই খোকন, ও কি হচ্ছে, আচ্ছা ইম্পার্টিনেন্ট তো, অত নাড়ালে মূর্তিটা ভেঙে যাবে যে, এদিকে এস। ভারি দুরন্ত হয়েছে ছেলেটা।—

লছমী ট্রে-তে করে কিছু খাবার আর চা নিয়ে এল। সরমা তার হাত থেকে ট্রে টা তুলে নিয়ে গোলটেবিলে রাখল। তারপর একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বসে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, ছোট বয়সে অমন দুরন্ত সকলেই হয়। তুমি দুরন্ত ছিলে না ?

কৃষ্ণনাথ হাত গুটিয়ে ট্রে থেকে একটা খাবার তুলে নিয়ে মুখে পুরে বলল, বাঃ, এসব রেঁধেছে কে, তুমি? ওঃ, কত দিন বাদে মাছের কালিয়া খেলাম!

বিদ্যুৎ এসে সরমার গা ঘেঁসে দাঁড়াল। ওর হাতে একটা চপ তুলে দিয়ে সরমা বললেন, কেন, বাড়িতে এসব হয় না বুঝি?

আর বল কেন, বউ কি এ সব খেতে দেয়? বলে বেশী-গুরুপাকের জিনিস খেলে ব্লাডপ্রেসার বাড়বে।

সরমা মুচকি হাসলেন,—তাতো ঠিকই বলেন। এ সব রোগে একটু বাছ-বিচার করে চলা উচিত বৈকি।

কৃষ্ণনাথ বললে—নিয়ম, ছোঃ! ইচ্ছেমত খেতে না পারলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয়? তোমরা মেয়েরা সব এক জাতের।

সরমা হাসলেন। হাসতে শরীরের অবসাদ অনেক দূর হল। শীতের বিকেল, নিভু নিভু সূর্যের আলো। একটা পরিচিত আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে বাইরে, দূরের পাহাড়ে, ঘোড়ানিম গাছের মাথায় বারান্দার মেঝেয় ঘরে।

খাওয়া শেষ হলে সরমা বললেন,—আলোটা জ্বালব?

কৃষ্ণনাথ বলল,—না থাক, চল বাইরেটা ঘুরে দেখে আসা যাক।

ওরা দুজন বাইরে চলে এল। কৃষ্ণনাথ সামনের বাগানটায় ঢুকে পড়ল। সরমা এলেন পিছু পিছু। রকমারী মরশুমি ফুল ফুটেছে বাগানে। সন্ধ্যার আবছায়ায় সেগুলি ধূসর বর্ণহীন। রাস্তার পাশে সাঁই বাবলার পাতায় থোকা থোকা কুয়াশা জমছে। তার ভিতর থেকে একটা পাখির ছানার অস্পষ্ট ক্ষীণ কান্না ভেসে আসছে।

কৃষ্ণনাথ বলল,—ভালই আছো বলতে হবে। মিশনারী স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। ভালো মায়না পাচ্ছ নিশ্চয়ই, বেসিক কত?

তিনশ' টাকা—সংক্ষেপে জবাব দিল সরমা।

—এতবড় কোয়াটার, মোটা মায়না। তাহলে এতদিনে ওয়েলপ্লেসড হলে, কি বলো!

কৃষ্ণনাথের কথাগুলো সরমার কাছে সান্ত্বনার মতো মনে হল। ওয়েলপ্লেসড। ওয়েলপ্লেস্ড বলতে কি বোঝে কৃষ্ণনাথ। অর্থ প্রতিপত্তি সম্মান। হিমহিম কুয়াশায় চশমাটার কাচদুটো ধোঁয়াটে হয়ে আসছে। সরমা নাক থেকে চশমাটা নামালেন।

কৃষ্ণনাথ একটানে একটা ডালিয়া ফুল ছিঁড়ে সেটার পাপড়িগুলো ছড়াতে ছড়াতে বলল,—দেহাতী মেয়েটাকে দেখলাম, ও কে?—রান্নাবান্না করে দেয় বুঝি?

সরমা জবাবে ছোট্ট করে একটা 'হু' করলেন।

—তোমার ভাইরা কোথায়?—কৃষ্ণনাথ বলল।

—কলকাতায়।

—তোমার একটি ছোট বোন ছিল না?

—হু, এবার স্কুল-ফাইন্যাল দিচ্ছে।—ক্লান্ত, সরমা বড় ক্লান্ত।

—বড় ভাইটি কি করে?

—একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরী করে। কথা গুলো যেন বুক-চিরে বেরোল।

—ছোট ভাইটি চাকরী পায়নি এখনও?

—না, ও পড়ছে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে।

—ওয়েল, ওয়েল! তাহলে সব মিলিয়ে ভালই আছো।

কৃষ্ণনাথের কথাগুলো সরমার কানে ছুঁচের মত বিঁধল। নির্বোধ, নিতান্তই নির্বোধ কৃষ্ণনাথ। একটা পুরোনো রেকর্ডের মত বেসুরো। আর তার শরীরটা এই আবছায়ায় কেমন যেন অস্পষ্ট। মনে হল যেন সে একটা ধোঁয়াটে কাচের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

টুং টুং করে ঘন্টি বাজল গেটের কাছটায়। ব্রীজমোহন এসেছে। কৃষ্ণনাথ সচকিত হয়ে বলল, বিদ্যুৎকে ডাকো তো। এক্ষুনি ফিরতে হবে। সাতটার ট্রেনটা যে-করেই হোক ধরতে হবে। সকালে আবার অফিসে একটা জরুরী কাজ আছে।

কাজ আর কাজ। কৃষ্ণনাথের এ অজুহাতটা সরমার কাছে মিনতির মত মনে হল। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার, কাজ প্রচুর আছে বৈকি। সরমার মনে হল পালাতে চাইছে কৃষ্ণনাথ। দীর্ঘ পনের বছরের ব্যবধানের পর হয়ত এই অপ্রত্যাশিত সান্নিধ্য অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে। ভয়, সরমাকে? কেন? সরমার ঠোঁটের পাতা ভারি হয়ে এল। কপালের রেখাগুলো আরও ঘন হয়ে উঠল। একটা অবদমিত ক্রোধ সমস্ত শরীর পেচিয়ে ঘুলিয়ে ঠেলে বেরোতে চাইল। তথাপি সরমা নির্লিপ্ত নিস্তেজ। তথাপি তিনি মিষ্টি করে হাসলেন। হেসে হয়ত কৃষ্ণনাথকেই সান্ত্বনা দিতে চাইলেন, কেন ভয় কিসের? কাজ না ছাই! বল বউয়ের আদেশ আছে।

কৃষ্ণনাথ বিবর্ণ হেসে বললেন, বউয়ের আদেশ? তুমি এখনো আগেকার মত ছেলেমানুষ আছো দেখছি।

একটা বিশাল গাছের গুঁড়িকে করাত দিয়ে চেরাই করার সময় যেমন বিকট আওয়াজ হয়, সরমার কাছে তার কথাগুলো তেমনি কর্কশ লাগলো।

ব্রীজমোহন উঠোন থেকে হাঁক পাড়লো, বাবুসাব ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ এতক্ষণ ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করছিল। একলাফে উঠোনে নেমেই টুক করে সরমার পায়ে হাত দিয়ে বলল—যাই মাসিমা।

সরমা তাকে বুকে টেনে নিলেন। সস্নেহে চিবুক স্পর্শ করলেন। একটা নরম উষ্ণ পাখীর মত ছোট্ট শরীর। মাসিমা, মাসিমা! কথাটাকে সরমা শরীরী চেতনা দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করলেন। তারপর কি ভেবে বললেন, একটু দাঁড়াও বিদ্যুৎ, আসছি। —বলেই সরমা ছুটে ঘরে চলে গেলেন। একটানে দেরাজটা খুললেন। রবির জন্যে তৈরী করা সোয়েটারটা বের করলেন। তারপরে দৌড়ে চলে এলেন বাইরে।

কৃষ্ণনাথ বলল—ওকি, আবার সোয়েটার কেন, তিন-চার ঘণ্টার তো মামলা।

সরমা এতক্ষণে গলার স্বর যথাসম্ভব চড়িয়ে বলে উঠলেন,—এ নিয়ে তোমাকে খবরদারী করতে হবেনা। শীতের রাত, দুধের বাচ্চা, জমে হিম হয়ে যাবে না!

বলতে বলতে তিনি সোয়েটারটা সযত্নে বিদ্যুৎতের গায়ে পরিয়ে দিলেন।

ওরা তিনজন উঠান ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় নেমে গেল গীর্জাটাকে বাঁপাশে রেখে। তারপর ঘোড়ানিম গাছের পাতায় জমা ঘন কুয়াশায় হারিয়ে গেল।

সরমা পায়ে পায়ে পাতাখসা উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে এলেন। তারপর ঘরে। তাঁর মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। চোখের সামনে টেবিলে ডাঁই করা একরাশ পরীক্ষার খাতা, পাহাড়ের মত উঁচু। সাদাটে ঘরের একপাশে আলনা। আলনা ভর্তি শাড়ি-জামা-ব্লাউজ। একটা বিরাট আলমারী ভর্তি বই। মেঝেটা সাপের চামড়ার মত ঠাণ্ডা। ঘরের সব বাতাস যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হল সরমার। তিনি প্রায় দৌড়ে দক্ষিণের কাচের শার্সি দুটো খুলে দিলেন। তারপর অবসন্ন শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন বিছানায়।

দেওয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল। তিনি চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, ঘড়িটার পেণ্ডুলামটা দোল খাচ্ছে অনবরত। তাঁর মনে হল পেণ্ডুলামটা যেন একটা পাখি। আর তার চারদিকের ছোট্ট কাঠের আবরণটা যেন একটা খাঁচা। পাখিটা প্রাণপণে সেই কাঠের আবরণ ভেদ করে পালাতে চাচ্ছে, পারছে না। শুধু থেকে থেকে একটা নিষ্ফল ধাতব আওয়াজ তুলছে।

—— ——

॥ বিপ্রতীপ ॥

ভোর ভোর পাটুলির খাল থেকে ডুব দিয়ে এল নিতাই।

চটপট দোকানের ঝাপ খুলে ধুপধুনো দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সবকিছু গোছগাছ ঝাড়পোছ করে ফেললো। চটকাগাছের ডালে গুটিকয়েক কাক চেঁচাচ্ছিল একটানা। একমুঠো চিঁড়ে রাস্তায় ছড়িয়ে দিতেই নেমে এল হুড়বড়িয়ে ডানাদাবড়ে।

বিবিবাজার। ধনেখালি থেকে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কাচা সড়কটা এসে মাথা রেখেছে এইখানে। পাটুলির খালের বাঁকে। বেগমপুরের শিবমন্দির বরাবর। বিবিবাজার এ তল্লাটের একমাত্র গঞ্জ। সকাল-বিকাল লঞ্চ আসে সদর থেকে। শহর আর গ্রামের লেনদেন চলে বিবিবাজারের মারফত।

সারি সারি খুপরী। কঞ্চিবাঁশমাটি হোগলাচটার বনাত। মাথায় চৌচালা টোপর। গোলপাতা অথবা টালীর। শক্ত সুন্দরীকাঠের খুঁটি। হাজার ঝড়ঝাপটা সামাল দেয়। সকাল-সন্ধ্যা কিলবিল করা লোক জমে হাটাপথে এবং নৌকোয়।

হাট বল, বাজার বল, দশটা গ্রামের বেচাকেনার একমাত্র কেন্দ্র এই বিবিবাজার। সবকিছু মেলে এখানে। মোটামুটি জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। মিষ্টি চাই—আছে হালুইকরের দোকান। মিশ্রি বাতাসা হরেক রকম গুড় পাওয়া যাবে এখানে। রয়েছে চালডাল তেলনুনের পেল্লাই আড়ত। আনাজ তরিতরকারী মাছ কোনকিছুর অভাব নেই।

তবে হ্যাঁ—

ছিল এতদিন—একটি বিশেষ জিনিসের অভাব। একটা বইয়ের দোকানের। এ-তল্লাটের কাচ্চাবাচ্চাদের জন্য পুঁথিপুস্তকের।

সে অভাব পূরণ করেছে নিতাই। এতদিন সে শহরে ছিল। মোটামুটি লেখাপড়া জানা ছেলে। গ্রামে ফিরে বুঝলো একটা বইয়ের দোকানের বড়ই দরকার।

শুধু ব্যবসা করে পয়সা রোজগার নয় দেশের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক—এমনি এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নিতাই ব্যবসায়ে নেমেছে।

সন্তানহীন পিসীর পয়সাকড়ি ছিল। অনেক ধরে করে তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করেছে নিতাই।

বিবিবাজারের এই হাজার দোকানের হট্টগোলের ভিতর দোকান খুললো সে। সদর থেকে রঙদার সাইনবোর্ড তৈরী করে আনল। বড় বড় হরফে টিনের পলেস্তারায় জলজ্বলিয়ে উঠল 'শিক্ষা-বিপণী'।

আশা আছে, দাঁড়িয়ে যাবে 'শিক্ষা-বিপণী'। প্রতিযোগিতার আশংকা নেই। 'শিক্ষাবিপণী' বিবিবাজারের একক এবং অদ্বিতীয় বইয়ের দোকান।

সকাল সকাল দোকান সাজাতে বসল নিতাই। বই কম কেনা হয়নি। প্রাইমারী ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক থেকে ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা—এমন কি শরৎবাবু, বংকিমবাবুর খানকতক উপন্যাস পর্যন্ত। তার ওপর, শ্লেট, খাতা, কাগজ, কলম, পেন্সিল—টুকিটাকি।

ইচ্ছে তো ছিল মনের মত করে দোকান সাজাবার। কুলিয়ে উঠল না পয়সায়। বই ছাড়া দোকানের ভাড়া রয়েছে, গঞ্জের তোলা রয়েছে। টুকটাক আসবাব কিনতেও খরচ হয়েছে এককাড়ি। নইলে রবিঠাকুর পর্যন্ত নাড়াচাড়া করে দেখতো নিতাই।

দুপুরের দিকে মতিবাবু এলেন। রূপডাঙ্গা প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার। খুব তারিফ করলেন নিতাইকে। খুটিয়ে খুটিয়ে বইগুলো দেখলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন। সাধ্যমত নিজের স্কুলে বই কিনে তাকে সহযোগিতা করবেন।

নিতাই নেমে পড়ল কাজে। কোমর বেঁধে। সে জানত, খাটুনি মিথ্যে হবার নয়।

পরপর কতগুলো হাটবার পেরিয়ে গেল। পাটুলির খালের ঘাটে নৌকার ভীড় জমল। ঘাসি কেরায়া চালানী হরেক রকমের। আবার সেগুলো মিলিয়ে গেল ভাঙাহাটের মুখে। ভাটির জলের মত সরসরিয়ে। অথচ কাকপক্ষীটি ঘেঁসলো না শিক্ষা-বিপণীতে।

'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর'। সব খদ্দের ওদিকে। মুদি দোকানে। তরকারীর হাটে। পেট ছাড়া অন্য কোন বস্তুর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে একথা তারা মানতেই রাজী নয়।

নইলে এত জনসমাগম ঠাসাঠাসি গিজগিজ বিবিবাজার, আর সে বেচারী তীর্থকাকের মত বসে!

দিনে বেশী হলে দুটো টাকা বিক্রি। দোকানভাড়া বাদ দিয়ে বিড়ির খরচটা পর্যন্ত এতে ওঠে না।

সারাদিন হাত গুটিয়ে বসে থাকা। বড়োজোর বারকয়েক আলমারী ঝাড়পোছ করা, নয়তো বইগুলো উল্টেপাল্টে রাখা। এই তার দিনান্তের কাজ।

মতিবাবু আ.সন প্রায়ই। নিতাইকে উৎসাহ দেন, ভরসা দেন।

কিন্তু নিতাই সেঁদিয়ে গেছে ক'দিনেই। হাটবাজারের ভাবগতিক বুঝে ফেলেছে। আসলে 'নৈব চ নৈব চ'। হাত উল্টে ঝিমুনো ছাড়া কাজ নেই।

পাশের ঘর গরাণহাটার বিজয় পাটোয়ারীর। তামাক চিটে গুড়ের রাখি ব্যবসা। লোকটা হিংসুটের যম। কেবল দুবেলা কুতকুতে চোখদুটোতে অবজ্ঞার রেশ টেনে ধারাচ্ছে এদিকে।

ওর তাচ্ছিল্যে পরোয়া করেনা নিতাই। সে জানে, খাটতে পারলে ব্যবসা তার দাঁড়াবেই।

এরমধ্যে এক হাটবারে এক মজার খদ্দের জুটলো।

লোকটা চাষাভূষা শ্রেণীর। সটান দোকানে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে থ'বনে গেল। টাগরা উল্টে হা করে ফ্যালফেলিয়ে দেখল দোকানের জিনিস-পত্রগুলো। তারপর ঢোক গিলে বললো,

—পুতুলটুতুল আছে কিছু? এই ধরো বাচ্চাদের খেল্না—

—আজ্ঞে না।—বিনীত জবাব দিল নিতাই।

—ফিতা, মেয়েদের চুড়ি, চুলের কাঁটা ?

নিতাই এবার ঠোঁটের হাসি ছড়াল। মাথা নাড়ল—না, নেই।

খদ্দেরটি নিরাশ হল না, ভাল শাড়িকাপড় আছে? তাঁতের, মিহি জমিনের।

নিতাই বলল, আজ্ঞে, এটা বইয়ের দোকান। ওসব তো এখানে পাবেন না।

খদ্দেরটি মুখ ভেংচে বলে উঠল, কিছু নেইতো দোকান খুলে বসেছ কেন? রূপ দেখাতে?—একঝলক আগুনদৃষ্টি হেনে সে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

শহরে চলে এল নিতাই। সেই বিকেলেই। দেখে শুনে কেনাকাটা করল। টুকটাক রঙদার হালকা জিনিস কিছু। আলুর পুতুল, ডজন দুই ছোট সাইজের রবারের বল। চুলের কাঁটা, সিল্কের ফিতা, কাঁচের চুড়ি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

গঞ্জে ফিরে এসেই প্রথমে গেল পিসির বাড়ী। সেখান থেকে একটা সাবেকি আমলের বারকোষ নিয়ে এল। খাতাকাগজগুলো নামাল কাঠের আলমারীটা থেকে। খাতাকাগজগুলো নিচের তাকে রাখল। ঠেসাঠেসি করে। চেনাজানার মধ্য থেকে একটা কেরাসীনের টিন জুটিয়ে আনল। তার ওপর বারকোষটা পাতল। রাখল সামনের দিকে। এক এক করে সাজাল সবকিছু আলমারীতে, বারকোষে। একটা দড়ি টানালো ঘরের মাঝামাঝি আড়াআড়ি করে। সেখানে ঝুলিয়ে দিল ফিতা, ক্লিপ আর ঝিনুকের বোতাম।

এবার বিক্রি বাড়ল কিছু। ফি-রোজ বারোতেরো সিকির কাজ হয়। আমনের খন্দ। চাষাভুষোর হাতে কাঁচাপয়সা। এখন তারা দিলদরিয়া। ঝি-বউড়ির জন্য দুপয়সা আকছার ঢালতে কসুর করেনা।

অল্পসল্প সবকিছুই কাটে। কোনটা বেশী, কোনটা কম। হরেদরে পুষিয়ে যায়।

মহালক্ষ্মী সিঁদুর, হাড়ের চিরুণী, আয়না আর তরল আলতার কাটতি সবচেয়ে বেশী। বাকী-বকেয়ার কাজ নেই। সব নগদনারায়ণ। ইদানীং তাঁতের শাড়ী, গামছা, লুঙ্গী এগুলোই বেশী কাটছে।

বুদ্ধিশ্বর গোলদার সেদিন এলেন 'শিক্ষা-বিপণী'তে। ধনেখালি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। কালো কুচকুচে বিরাট চেহারা। বিদ্যা ঘুরঘুর ন্যায় ভুরভুর। বিস্তর জমিজমা আছে। তাছাড়া খানদশেক মাছের ভেড়ি।

নিতাই হন্তদন্ত হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। ভিতর থেকে সবেধন নীলমণি লোহার ভাঙা চেয়ারটা এনে দেয়। মাতব্বর লোকদের খাতির রাখা দরকার একথা নিতাই জানে।

বুদ্ধিশ্বর চারদিক তাকিয়ে নিলেন। বড় বড় চোখ করে। অনেক কষ্টে মস্তমুখে হাসি ঝরালেন খানিকটা। বললেন, বেড়ে হয়েছে দোকানটা। নিতাই হাত কচলালো, 'আজ্ঞে আপনাদের দয়া'—। যেমন বলদ তার তেমনি হাল। কোন লোককে কতটুকু তোয়াজ করতে হয় নিতাই জানে। বেশ ভাল করে। বুদ্ধিশ্বর মোটামুটি সন্তুষ্ট হলেন। ব্যবসাসংক্রান্ত দুচারটে নিবেদন ইতিমধ্যে সেরে ফেললো নিতাই। কথার ফাঁকে।

বুদ্ধিশ্বর আলমারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, কোথাকার শাড়ী হে—

—আজ্ঞে খাস ঢাকাই জিনিস, একনম্বর।

বলবার আগেই আলমারী খুলে একগাদা শাড়ী দেখালো গোলদারকে।

গোলদার একটা পছন্দ করলেন ওর ভিতর থেকে। পড়তায় ঠিক ঠিক পোষাল না। একটু কম লাভেই ছাড়তে হল নিতাইকে।

গোলদার ফের বললেন, বইটই আবার রাখো নাকি হে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—যাত্রার পালা বই আছে? এই ধর চন্দ্রহাস বা মানভঞ্জন?

—আজ্ঞে না।

এবার একটু থমকিয়ে গেলেন গোলদার। কি একটু ভেবে ফের বললেন, ব্রতকথা, টোটকা ওষুধের বই?

—আজ্ঞে ওসবতো রাখিনা। পয়সা কম। তাই দুচারটে ছেলেপুলেদের বই আর খানকতক নাটক-নভেল—

গোঁফের আড়ে হাসি লুকিয়ে গলার স্বর ভেঙ্গে বল্লেন গোলদার, নাটক নভেল? এই বাদাবনে! হাসালে নিতাই

দেখতে দেখতে বছর গড়ালো। দোকানের হাল ফিরেছে এতদিন। বিক্রি হচ্ছে দেদার। সবকিছু একা সামাল দিয়ে উঠতে পারছে না নিতাই। অষ্টপ্রহর ভীড় লেগেই আছে। থুকথুক হরহামেশা খদ্দের আসছে, যাচ্ছে। শেষটায়, একটা ছোকরা রাখতে হল দায়ে পড়ে। ফুট ফরমাস খাটবার জন্য। এখানে সেখানে বাকী বকেয়া আদায়ের জন্য। ঠিকমত তাগাদা না দিলে ধারদেনা তামাদি হয়ে যায়। খদ্দেরের অভ্যাসই ওই। ধারের প্রথমটায় গরম হাত। কথায় কথায় আগাম দিতেও কসুর নেই। শেষে পটিয়ে নেয় মিঠে কথায়। ছিচকে খাবলে ধার নেয়। শেষে টাকার অংক ভারী হলে মাড়ায় না এদিকে।

ছোকরা বিপিন করিৎকর্মা। নিতাইর কথায় দণ্ডবৎ। অবশ্য এজন্য তার খসছে মন্দ না। খোরাকী আর হাতখরচ পনের টাকা, এই কড়ারে রাখা হয়েছে।

আশ্বিনের গোড়া থেকে ব্যবসাপাতি বাড়ে। বাদার জল সরে। চারদিক থেকে লোক আসে হুহু করে। তখন জোর আটাআটি চলে এদোকানে-ওদোকানে। দু'টো কথা বলবার ফুরসুৎ থাকেনা। দুহাতে দশহাতের কাজ করেও কুলিয়ে ওঠেনা। নিতাই খাটে ভূতের মত।

দুপুরের দিকে ভীড় পাতলা হয়। ঝট করে নাকেমুকে খানিকটা গুঁজে ফের কাজে নেমে পড়ে নিতাই। দোকানটা জম্পেস করে গুছিয়ে নেয় উল্টে পাল্টে।

আলমারীর ফালতু বইগুলো নীচে নামায়। বারকোষ ভর্তি করে সেগুলো পাচার করে খাটের তলায়।

তারপর সাজায় থান কাপড়। গামছা, লুঙ্গি, সায়া, সেমিজে আলমারী দুটা হয় ভরভরতি। কিছুদিন হলো পাশের ঘরটাও ভাড়া নিয়েছে। একটা ঘরে সবকিছু আটে না। টিনের পলেস্তারাটা ওঘরে চালান দিয়েছে। এখন সেটায় চিটেগুড় রাখা হয়।

সামনের দিকে রাখা হয়েছে বুক অব্দি উঁচু পেল্লাই শো-কেস। চোখজুড়ানো কাঁঠাল কাঠের। মনিহারী জিনিসে সেটা খাসা মানিয়েছে।

হ্যারিকেনে চলেনা। কার্বাইড ল্যাম্প কিনতে হয়েছে। এ-ঘরের জন্য একটা, আর ও-ঘরের জন্য দুটো।

এঘর ওঘর যাতায়াতের জন্য মাঝের পার্টিশনটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। সবাই বলে, অত খাটিসনা নিতাই। শেষে শরীর ভেঙ্গে পড়লে কে দেখবে।

নিতাই হাসে। বলে, না খাটলে পয়সা আসবে কোত্থেকে।

ছাপ ছাপ দুপুরের রদ্দুর ঢোকে দোকানের ভিতর। মায়ের মিষ্টি স্নেহের মতো। চটকা গাছের সরু সরু পাতার জানালা গলে।

খেটে খেটে ক্লান্তি আসে। নিতাই গড়িয়ে নেয় দণ্ডভরে। ঘুম আসে না। আলমারীর তলা থেকে বই বের করে। অযত্নে পাতাগুলো লালচে হয়ে গেছে। টেনে নেয় ওর থেকে একটা। শরৎবাবুর বই পড়তে ভাল লাগে তার। এক একটা বই যে সে কতবার পড়েছে করে গুণে বলা যাবে না। আগে বই পড়ার খুব নেশা ছিল। এখন কমেছে অনেকটা। বাধ্য হয়ে। তবু পুরোন অভ্যেসটা ক্ষয়ে যায়নি একেবারে।

কখন বিকেল আসে টিপি টিপি, টের পায়না নিতাই। পাটুলির খালে

নৌকার লগি ঠকাঠক শব্দ তোলে। গুটিগুটি লোক জমে। দুপুরে ঝিমটির ঘোর কাটে। আবার জাগে বিবিবাজার। নতুন করে। আড়মোড়া ভেঙে হাই তোলে।

তড়াক্ করে কখন নিতাই লাফিয়ে ওঠে। হৈ হৈ করে, বিপ্‌নে—এই বিপ্‌নে, ওঠ্‌ ওঠ্‌। বেলা যে গড়িয়ে একহাটু।—তারপর কাঁধে গামছাটা ফেলে ছুট দেয় খালের দিকে।

স্নান করে এসে দোকানে বসে।

সেদিন মতি মাষ্টার এলেন। বৃহস্পতিবার, হাটবেলা। বেচাকেনার মুখে ভাল করে তার সঙ্গে কথা কইতে পারলনা নিতাই। দোকানে ঢুকেই তিনি বল্লেন, ব্যাপার কি! আর একটা ঘর নিলে নাকি ?

নিতাই হাসল একগাল। বলল, কি আর করি বলেন। একটা মেটে ঘর। সবকিছু ধরে না। তাই পাশের ঘরটা নিতে হ'ল।

—বেশ, বেশ। ভাল করেছ। তা—কিসের দোকান খুলচ ?

...আজ্ঞে টুকটাক চালডালের।—আগের মত বকর বকর করতে ভাল লাগে না নিতাই'র। একটা বিড়ি তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সংক্ষেপে কথা সারতে চায়। মতিবাবুও উঠি উঠি করেন।

—কি চাই ?

—একপো তালের মিশ্রি।

—চারহাতি গামছা, পাঁচসিকের কম পাবেননা কোথাও।

—ভাল গুড় আছে ?

—আজ্ঞে, একেবারে মিশ্রিদানা। খুব সরেশ। বিপ্‌নে পাঁচসের বাঁশফুল চাল দে ওনাকে।—গোটা বিবিবাজার হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিতাই'র দোকানে।

—বাঃ! বেড়ে গণেশ ঠাকুর তো! কোত্থেকে আনলে ?

—কেষ্টনগরের জিনিস।—নিতাইর হাত আর মুখ চলে সমানে।

—বিপনে, আবার কই গেলি ?

বিপিন ততক্ষণে দোকানের চালে উঠেছে। সেখান থেকে জবাব দেয়, সাইনবোর্ড লটকাচ্ছি কর্তা।

—দেখোতো যজ্ঞেশ্বর, কেমন হল সাইনবোর্ডটা।—চাল মাপতে মাপতে নিতাই বলে।

—বেড়ে হয়েচে!

'শিক্ষাবিপণী' সাইনবোর্ডটা পাল্টে সেখানে লটকে দেওয়া হচ্ছে 'অফুরন্ত ভাণ্ডার'। যাবতীয় মুদীমসলার একমাত্র দোকান।

বছর না ঘুরতেই দোকানের ভোল পাল্টালো। নিতাই'র বরাত খুলে গেল। আয় বাড়ল চড়চড়িয়ে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে লালখাতায় আঁচড় বুলিয়ে চলল সে।

এর মধ্যে দু'দুটো ফেরী নৌকা কেনা হয়েছে। খালের খেয়ার ইজারা নিয়েছে। বুদ্ধিশ্বর গোলাদারকে ভজিয়ে ভাজিয়ে। কিছু দিয়ে তুষ্ট করে।

মদন সে দিন এসেছিল। সম্পর্কে নিতাই'র জ্ঞাতি দাদা। জবর এক খবর দিল। একটি পাত্রী দেখা হয়েছে। হবিবপুরের মেয়ে। বাপের জমি-জমা আছে বিস্তর। একটি মাত্র সন্তান। দেবে দুহাত উপুর করে। দেখতে মন্দ নয়। মোটামুটি স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী।

নিতাই প্রথমটায় আমতা আমতা করল। ওটা এটা অজুহাত দেখালো। মদন ওতে ভুলবার লোক নয়। ব্যবসাতো চলছে বেশ। কাঁচা বয়স। হাতে পয়সা আসছে অনেক। বয়স থাকতেই বিয়ে করা উচিত।

নইলে—

বলাতো যায় না। কখন কি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে নিতাই।

ওজর আপত্তি টেকেনি শেষ পর্যন্ত। রাজী হয়েছে নিতাই।

গাজনের মেলা বসে চৈত্রের শেষ হাটে। সবে স্নান সেরে দোকান খুলতেই ঝগড়া সুরু করে দিল বিজয় পটোয়ারী। খামাকা। অনেক দিন ধরেই চলছে খটাখটি। ভেতরে ভেতরে ফুলে আছে বিজয়। হিংসুকের হদ্দ। অন্যের ভাল চোখে সয় না।

নিতাই ছাড়ে না। খদ্দের তার দোকানে আসে সে কি তার দোষ? জমিন ঢালু যে দিকে জল গড়াবে সে দিকে। কম পয়সায় সে জিনিষ ছাড়ছে খদ্দের আসছে হুড়মুড়িয়ে।

এত খুব সহজ কথা।

কুদঘাটার ঠিকাদার পালান মিটিয়ে দিল ব্যাপারটা। পাশাপাশি দোকান। রাতদিন ঝগড়া করলে চলে?

সাতসকালেই ঝগড়া হয়ে গেল। মনমেজাজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছত্রিশ। রাগে জ্বলছিল নিতাই।

এমন সময় এক খদ্দের এল দোকানে। ছোকরা গোছের। ভিতরে হুড়বড়িয়ে ঢুকেই শো'কেসের ওপর কনুই রেখে চারদিকে চোখ বুলোতে লাগল।

নিতাই কড়াগলায় জিজ্ঞেস করল, কি চাই ?

—বই।

—বই !—যেন সাপে কামড়ালো নিতাইকে। এক ঝলক বিস্ময় কণ্ঠস্বরের তরলতায় গলে পড়ল অজান্তেই।

—হ্যাঁ মশাই. রবি ঠাকুরের কবিতার বই। এতবড় হাট, বইটই রাখেন না কিছু ?

না।—রুক্ষ জবাব নিতাই'র।

ছোকরাটি খিঁচিয়ে উঠল, তবে বসেছেন কেন এখানে ; তেলনুন বেচে পয়সা কামাতে। ছেলেটির স্বরে অবজ্ঞার ঝাঁঝ।

—হ্যাঁ,—রুখে উঠল নিতাই, কে আপনার জন্য এই বাদাবনে বই সাজিয়ে রাখবে বলুন।

ছোকরা মুখে একরাশ বিতৃষ্ণার কুঞ্চন তুলে গটগট করে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

ছেলেটি চলে গেলে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিতাই। ভূতে পাওয়া রোগীর মত। বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠল। একটা কিছুর শূন্যময় অনবস্থিতির অনুভবে চোখদুটো টনটনিয়ে উঠল।

———

॥ জীবিকা ॥

সকালের আঁচ লাগতেই ঝিমিয়ে-পড়া প্রসঙ্গটা লকলকিয়ে উঠল ফের। বিষয়টা নতুন কিছু নয়। তবে আজকের বিশেষ একটি সকালে তার গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। নিদেন পক্ষে দু'সের চালের দরকার। আর তা এই মুহূর্তে।

ঘুম না ভাঙতেই এমনি করে খুঁচিয়ে তুললে মেজাজ কার না খিঁচড়ে যায়। বিপিনও পারেনি নিজেকে সামলাতে। তবে জ্ঞানদার মুখের ওপর কিছু বলার সাহস তার ছিল না। তাই বিরক্তি আর ক্ষোভ একটু বাঁকা ভাবে মোচড় দিয়ে উঠল।

সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রাধা। তাকে ঘা-কতক বসিয়ে গায়ের ঝাল ঝাড়লো। অবশ্য মারবার পেছনে সে মনে মনে একটা অজুহাত খাড়া করে রাখল। সাত-সকালে তার এক ছিলিম তামাকের দরকার। নইলে, শরীরের ভার যেন কমে না। সকালটা মাটি মাটি মনে হয়। বুকটা ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে আসে। রাধাকে সে এক ছিলিম তামাকের জন্যে বলেছিল। একবার, দু'বার, তিনবার। কোন ফল হয়নি। শেষে জ্ঞানদার চোপরার বিষ আরও ফেনিয়ে উঠেছে। বেধড়ক রাধাকে পিটিয়ে শরীরের চাগিয়ে ওঠা রাগ ঝেড়ে নেয়।

জ্ঞানদা তখন বাইরে ছিল। ঘরে দাপাদাপির শব্দ শুনে ছুটে এল হা হা করে। ঢুকেই মুখে এক পাঁজা বাসনের ঝনঝনানির আওয়াজ তুললো। অতবড় ডবকা মেয়ে। বিয়ে দিলে এতদিনে গ্যাগ্ গ্যাগ্ ছেলেপুলেতে ঘর ভরে যেত। বাপ বলেই তাকে আন্‌ছান্ আক্‌ছার পিটতে হবে। এ কেমন ধারার চরিত্তির।

বিপিন ফুঁসে উঠল। ধিঙ্গি মেয়ে নোটন নোটন ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা পাড়া। যার তার সঙ্গে গলাগলি রঙ্‌মস্করা করছে। সেদিকে খেয়াল আছে কারুর।

কথাটা তাকে খোঁটা দিয়ে বলা একথা বুঝতে জ্ঞানদার কষ্ট হল না। সেও প্রস্তুত ছিল এর জন্যে। জ্বলে উঠল চড়াৎ করে। শুধু পিটলেই চলে না। বাপ হয়ে গতরের হিল্লেটাও করতে হয়। খেতে নেই পরতে নেই কিলোবার গোঁসাই। দুদিন হলো ঘরসুদ্ধ সবাই না খেয়ে। একটি দানা পর্যন্ত কাটেনি

কেউ মুখে। সেদিকে খেয়াল আছে মিন্সের? কেবল হুকুম হচ্ছে বাবুর। খনে খনে তামাক সাজো। বেহায়া পুরুষ মানুষ কোথাকার!

বিপিন এবার থিতিয়ে গেল। কথা জোগাল না মুখে। ঘরের এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে পড়ল। চোখ বুঁজে রইল খানিকক্ষণ। একটা দরমার কুটো কাটতে লাগল দাঁতে। দুচোখ ছাপিয়ে জল এল। হুহু করে। কেউ যদি তার দুঃখ বুঝতো! না বউ, না মেয়ে। এতদিন একটা কাজ ছিল। হরিমিস্ত্রির দলে জোগানের কাজ। দরদালান তৈরীর কাজ। বেজায় খাটুনি। বাঁশে দড়ি বেঁধে মই করা লরী থেকে পাঁজায় পাঁজায় ইট বয়ে আনা, কাড়ি কাড়ি চুণসুরকী মাখা, রোদ নেই ঝড় নেই মাথায় চটের ফেঁসো জড়িয়ে মাল তোলা দোতলায় তিনতলায়। খুব কষ্ট হ'ত। তবে সে খেটেছে দিনের পর দিন। আর সকলের মুখের দিকে চেয়ে।

তারপর একদিন আকাশের মুখ কালো হয়ে এল। অলক্ষুণে বৃষ্টি নামল। ঝমঝমিয়ে, টিপটিপিয়ে। একমাস দুমাস তিনমাস। দরদালানের কাজে ভাটা পড়ল। হরিমিস্ত্রি জবাব দিল একদিন।

তবু চেষ্টার কমতি হয়নি। ফের কাজের ধান্ধায় টই টই করে ঘুরেছে। প্রথমে গেছে বালীগঞ্জ ইষ্টিশনে। কুলির কাজের জন্য। হয়নি। রেল-কুলিদের দল আছে, জোট আছে। ভাগিয়ে দিয়েছে। হটিয়ে দিয়েছে আইন আর জোরের ভয় দেখিয়ে। তারপর গেছে নিতাই ঘরামির কাছে। তার মস্ত বাঁশের দোকান। বজবজ লাইনের ধার ঘেসে। রেলকলোনীর গায়ে। বেশ কয়েকদিন কাজ করলো সেখানে। কচার বেড়া বাঁধবার কাজ। টিকল না শেষ অবধি। ফুরনের কাজ। ফুরন শেষ হয়েছে। কাজ চলে গেছে।

জ্ঞানদা এসব ধানাই পানাই শিবের গীত শুনতে রাজী নয়। আর শুনবেই বা কেন। শুনবার মত মুখ বিপিন রাখেনি। পরপর চারটে দিন জ্ঞানদা চালালো। ধার করে, মেগে পেতে। সবার কাছে সে হাত পেতেছে। পঞ্চাননতলা বস্তির এই ব্লকের সবক'টা ঘরে। লাজ-লজ্জার মাথা চিবিয়ে সে নুলো হাত বের করে ঘুরেছে দোরে দোরে। কিন্তু ধারে ক'দিন চলে। কার এত আছে যে চাইলেই দুহাত ভরে দেবে? দুদিন হলো মাথা খুঁড়েও এক গোটা খুদ মেলেনি কোথাও। আর যদি থাকত দুটো কাঁসা বা পিতলের বাসন। বেচে বন্ধক দিয়ে একটা কিছু করা যেত। থাকার মধ্যে ফালতু হাবিজাবি মাটির থালা-পাতিল আর তেল-চটা চালুনের মত ফুটো এনামেলের একটা শানকি। নেই নেই। এ সংসারে আগুন লেগেছে।

বিপিন বোঝদার মানুষ। কিন্তু সেই বা কি করবে। চেষ্টার কসুর তো হচ্ছে না। আতিপাতি করে সবকটা চিন্‌পরিচয় আস্তানায় ঢুঁ মেরেছে বারবার। হয়নি কিছুই। সবই অদেষ্ট। নইলে—

জ্ঞানদা খেকিয়ে উঠল। মরদ-মানুষ! বিয়ে করে সন্তান জন্মাতে তো খুব সখ ছিল। এবার মাগ-পুতকে খেতে দেবে কে? খেটে আনতে না পারুক চুরি করুক, ডাকাতি করুক, সিঁদ কাটুক। ওসব গা ঢালা কথায় পেট ভরে না।

পালান দাওয়ায় পা ছড়িয়ে মাথা দুলিয়ে মিন্‌মিনিয়ে ছড়া কাটছিল—'বৃষ্টি তুই সরে যা' ভাঙা হাড়ির মাথা খা।' বিপিন নেমে এল দাওয়ায়। না! এ পোড়া বিষ্টি থামবে না। হাজার ভাঙা হাড়ির দিব্বি কাটলেও না। এলোকেশী কাঁদতে বসেছে সেই কবে থেকে। কাঁদাচ্ছে সকলকে। ওর অলক্ষুণে কান্নায় ভেসে যাবে বিপিনের সংসার। ভাসবে, অকূলে ভাসবে সবাই।

বিপিন এসে কাছে বসতেই পালান চুপ করে গেল। বিপিনের আট বছরের মা-মরা ভাগ্নে। পরপর দু-দুটো ছেলে মরবার পর জ্ঞানদা ওকে এ সংসারে এনেছে। পালান কি একটা চিবুচ্ছিল। বিপিন বল্ল, কি খাচ্ছিসরে? শুকনো গলায় জবাব দিল পালান,—আমচুর। বিপিনের বুকটা ভাজা খইয়ের মত ছ্যাং করে উঠল। কি আছে ওতে? না রস, না আস্বাদ! শুধু দড়ির আঁশের মত লম্বা লম্বা ছোবড়া। খিদের পেটে মুখটাকে সরস রাখার চেষ্টামাত্র।

বিপিন নিজেও ভেঙ্গে পড়েছে। আজকাল খিদে সইতে পারেনা। সারারাত খিদেয় এপাশ ওপাশ করেছে। ভোরের আঁচে সেটা যেন চাগিয়ে উঠেছে চতুর্গুণ। পেটের নাড়ীভুড়িগুলো পাক খাচ্ছে কেঁচোর মত। থেকে থেকে ভীষণ চিলিক মারছে। হাড়গোড় ভেঙে কান্না ঠেলে ঠেলে আসতে চায়।

জ্ঞানদা বাইরে গিয়েছিল। বিপিন রাধাকে ডাকল—'তোর মা কইরে রাধি?' রাধার রাগ তখনও পড়েনি। দেয়ালে গা ঠেসান দিয়ে মুখ অব্দি কাপড়ের আঁচলে ঢেকে দাঁড়িয়েছিল একঠায়। মাথা ঘোঁচ করে। বিপিন ডাকলো ফের। জবাব নেই। এবার চেঁচিয়ে উঠল। রাধা জবাব দিল ফুলে ফুলে—'কলতলায় গেছে।' বিপিন এবার দ্বিগুণ জোরে চ্যাচালো—'ডেকে নিয়ে আয় শিগগীর।'

জ্ঞানদা এলো খানিক পরে। জলে-কাপড়ে একসা হয়ে। বললো গলার স্বর গম্ভীর করে, যা হয় একটা কিছু করো। অন্তত ক্ষুদের চাল হলেও যেমন করে হোক চলবে। পোড়া পেটের জ্বালা আর সহ্য হয়না বাপু।

চাল আর চাল। এই চালের জন্যেই সব। চাল ঘরে আছে তো বাঁচো, হাসো, মাগ-পুতের মুখে হাসি ফোটাও। আর না থাকে খিদের জ্বালায় দাপাও। নিজে মর। বাড়ীর সকলকে খেপিয়ে তোলো', খিদের আগুনে পুড়িয়ে মারো।

দণ্ডতরে বিষ্টি থামল। কাঁধে গামছাটা ফেলে রাস্তায় নেমে পড়ল বিপিন। অনেকটা তাড়া খাওয়া কুকুরের মত। রাস্তাঘাট জলে কাদায় থৈ থৈ। বস্তির যতরাজ্যের ময়লা আবর্জনা ধুয়ে রাস্তাঘাট ভাসিয়ে দিচ্ছে।

একটানা বিষ্টিতে চারদিকে যেন কেমন একটা কালো কুয়াশা নেমেছে দল বেঁধে। এঘরে ওঘরে উনুন ধরানো হয়েছে। চাপ চাপ ধোঁয়ায় দূরের জন-মানুষ চোখের নজরে আসে না। বজবজ লাইনের ধার ঘেঁসে খাটালগুলোর পাশে সারবন্দি একঠ্যাঙা নারকেল গাছগুলো কাঁপছে হি হি করে। একটা মাল-ট্রেণ কানাচোখে ধোঁয়াটে আলো ফেলে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল।

বিপিন একে একে সব কটা চেনা-জানা ঘরে ঢুঁ মারল। ফয়দা হল না কিছুই। সব শেয়ালের এক রা। একই অভাব ঘরে ঘরে। অথচ চাল তার চাইই। যেমন করে হোক, অন্তত দুসের চাল। নইলে মরবে দুধের বাচ্চা পালান। মরবে জ্ঞানদা, রাধা—সবাই।

বেশি হাঁটলে কোমর অবশ হয়ে আসে। একটা দোকানের ঝাঁপের তলায় দাঁড়িয়ে বিপিন খানিকটা জিরিয়ে নিল। শরীরে একদম জোর নেই। চিবুক ঠেকেছে কণ্ঠার হাড় পর্যন্ত। কুলোর মত ঢাউস-বুকটা বাজে পোড়া গাছের মত ভেঙে দুমড়ে গেছে। হাতের খসখসে নীলচে শিরাগুলো চামড়ার খোলস ছেড়ে কিলবিলিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বেশি হাঁটলে মাথা ঘোরে। বুকটা ঢিবঢিব করে। চোখে অন্ধকার দেখে। অথচ, এমন দিনও ছিল, যখন সে দশ-বারো ক্রোশ পথ ভাঙত একবেলায়। কাজে-অকাজে টক্কর মেরে বেড়াত তামাম তল্লাটটা।

চাল—চাল। চাল তার চাইই। অন্তত দু'সের। যেমন করে হোক। বিপিন আর ভাবতে পারে না। মাথার ঘিলু যেন ফুটছে টগবগ করে। কানের দুপাশের রগগুলো দপদপিয়ে উঠছে।

অনেক ঘোরাঘুরির পর হিল্লে হল একটা। অনেকটা অপ্রত্যাশিত-ভাবেই কাজ জুটে গেল। আর সে এক চালের গুদামেই। ঝাঝারিয়ার চালের আড়তে। এক লরী মাল এসেছে। সেগুলো তুলতে হবে গুদামে। ঝাঝারিয়া প্রথমেই সাফ সাফ বলে নিল। কুড়ি বস্তা মাল। প্রতি বস্তায়

দু'মন করে চাল। মজুরী পাবে দু'টাকা। শেষে মজুরী নিয়ে ঝঞ্ঝাট করা চলবে না।

এক কথায় রাজী হয়ে গেল বিপিন। কাজটা বেশ ভারী। রশিটাক পথ ভেঙে চাল গুদামে তুলতে হবে। আঁট করে গামছাটা মাথায় পেচিয়ে সে কাজে নেমে পড়ল। কাজটা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় তত তার সুবিধা। বাড়ী ফেরা যাবে অন্তত দু'সের চাল আর খানিকটা তেল-নুন নিয়ে। মুখে হাসি ফুটবে মা-মরা ছেলেটার—বউটার—মেয়েটার।

আধঘণ্টার জন্যে টিফিন। বেলা দুটোয়। ময়লা ছেঁড়া ফ্যাসফ্যাসে মেঘের ফাঁক দিয়ে খানিকটা সোহাগ-রোদ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ঝাঝারিয়ার কাছ থেকে টিফিন বাবদ তিন আনা পয়সা নিয়ে বিপিন চলে এলো তেলে-ভাজার দোকানে। কিছুটা মুড়ি আর তেলে-ভাজা কিনল। ঘামে-জলে শরীরটা আঠাআঠা হয়ে গিয়েছিল। গুদামের কাছেভিতে একলাটি বসে বেশ করে গামছা দিয়ে শরীরটা পুছে নিল। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে ঝিম্ ধরে বসে রইল খানিকক্ষণ। বুকে ঢেকির পাড় তুলে অনেকক্ষণ হাঁপালো শ্রান্ত কুকুরের মতো। তারপর একটা ফুলুরি ভেঙে মুখে পুরল। নোনতা গ্যাজলায় টাগরা হট্‌কা গিলতে গিয়ে বিষম খেল আচমকা। খকখক করে কেশে নিল খানিকক্ষণ। তারপর বুকের সর্দি টেনে নিয়ে রাস্তার কাছে গেল। একপেট জল খেয়ে তবে নিশ্চিন্ত।

তবু তার সোয়াস্তি নেই। একটা অবাঞ্ছিত দুশ্চিন্তা করাতের মতো অনবরত তার মনটাকে কেটে ফালি ফালি করছিল। দু'পল্লা ঘুরে মনটাকে বাগে আনবার চেষ্টা করল।

পালান হয়ত এতক্ষণে ভেউকান্না জুড়ে দিয়েছে। সোমত্থ মেয়ে রাধা বোঝদার। মুখ ফুটে বলবে না কিছু। তবে, কাজে-অকাজে জ্ঞানদার পিছন পিছন ঘুরছে। গাল চোপাটি চুপ্‌সে গেছে। পুঁই-ডাটার মত নেতিয়ে পড়েছে কখন। চোখ দুটো খাদে ঢুকেছে। অথচ ছিল তার সবই। যেমন ডাগর ডাগর ভাটামাছের মত ভাসাভাসা চোখ, তেমনি কোমর অব্দি ছড়ানো মিশকালো একরাশ চুল, টসটসে পুরন্ত গাল, কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ্। ঠিক যেন লক্ষী প্রতিমা! বিপিন সাধ করে ওর নাম রেখেছিল রাধারাণী। রাধাও বটে রাণীও বটে। জ্ঞানদার সাতচড়েও রা নেই। সেই যেদিন আটনখোলা থেকে ছোটখাট জ্ঞানদাকে বউ করে আনলো, সেদিন থেকে দেখছে বিপিন। খাটতে পারে ভুতের মতো। হাজারো ঝড়ঝাপটা দুঃখ দুর্দশায়

পরোয়া নেই। একহাতে দশ রথের কাজ করবে চোখ বুজে। তবু মানুষ তো! আর মানুষ বলেই ভগবান পেট নামে শত্তুরটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর পেট আছে তাই তার খাক আছে। খিদে তৃষ্ণায় ভাত-জল দিয়ে তাকে তুষ্ট করতে হয়। তবে জ্ঞানদার খিদের জ্বালাটা একটু অন্যভাবে মোচড় দিয়ে ওঠে। পেট থেকে ধীরে ধীরে সেটা চিতিয়ে ওঠে মুখে। মুখ থেকে সেটা বেরোয় ফোটা খইয়ের মতো। অনর্গল একনাগাড়ে। তখন একবার বকে পালানকে, একবার রাধাকে। শেষে গলা ধরে আসলে দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথা গলিয়ে জবুথবু হয়ে বসে থাকে বুঁদ হয়ে। হাজার ডাকলেও সাড়া মেলেনা তখন।

একটা বেওয়ারিশ কুকুর ঘুরঘুর করছিল বিপিনের চারদিকে। সে ডাকল ইশারায়। টোকোরের মুড়ি কটা ছিটিয়ে দিল মাটিতে। তারপর সোজা চলে এলো বড় রাস্তায়। দোকান থেকে বাকি দু'পয়সার বিড়ি কিনলো। ফিরবার পথে হঠাৎ ভবতারণের সঙ্গে দেখা। বস্তিতে পাশাপাশি ঘর। বিপিন তাকে ডেকে বলল, বাড়ী যাবি? ভবতারণ ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ। মিনতিতে ভেঙে পড়ল বিপিন, রাধির মাকে বলিস বিকেলের দিকে চাল নিয়ে বাড়ী ফিরব। উনুন ধরিয়ে সব ঠিকঠাক করে রাখে যেন।

খবরটা দিয়ে বিপিনের বুকটা অনেক হাল্কা হল। গুদাম ঘরে ঢুকেই সে ঝাঝারিয়ার কাছে গেল। হাত কচলে নরম গলায় বলল, আমায় দু'সের চাল দিতে হবে কিন্তু লালাজী। ঝাঝারিয়া বস্তার হিসাব করছিল। বিরক্ত হয়ে রুষ্টস্বরে সে বলল, সে হবে এখুন। আগে কাজটা খতম করে লেতো।

চাল এসেছে হরেক রকম। বিপিন দাঁড়ালো খোলা বস্তাগুলোর সামনে। বাঁশফুল, শীতলভোগ, চামরমনি, এক নম্বর পাটনাই। দেখেও সুখ আছে। একটা বস্তা থেকে কোষখানেক চাল মুখে তুলে পরখ করল। না, চমৎকার চাল। তবে হ্যাঁ, দেশ-গায়ের তেমন চাল এখানে চোখে পড়ে না। যেমন ধরা যাক চিনা, বালাম, সাক্কারখোঁড়া বা কালোজিরে চাল। অমন মিহি ধবধবে রঙ, ভুরভুরে গন্ধ কোথায় মিলবে! ডাল চাইনা, তরকারী চাইনা, শুধু বেশ করে একথালা বালাম চালের ভাত দাও। সঙ্গে দুটো ধানি লঙ্কা আর খানিকটা নুন। নিমেষে শেষ হয়ে যাবে।

শুকনো জিবটা লকলকিয়ে উঠল নিজের অজান্তেই। ঝাঝারিয়ার হুংকারে হুঁস এল। পায়ে পায়ে সে গুদাম ঘরের দিকে চলে এল। চাল। হ্যাঁ চাল তার চাইই। অন্তত দু'সের। আর তা মিলবেই দু'ঘণ্টা বাদে। মাথায়

কের বেশ করে গামছা পেচিয়ে নিয়ে কাজে নামল। ভেতরে ভেতরে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। কাজের মাঝে মাঝে কখন ধরাগলায় গুনগুনিয়েও চলল বহুদিন আগেকার হারিয়ে যাওয়া মুকুন্দদাসের গান। টাকায় ছিল একমন চাল ভাই, এখন বিকায় পসারি—

রেল লাইনের পাশে ছড়ানো টুকরো কাঠ এক পাঁজা বুকে করে ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল জ্ঞানদা, রাধি, রাধি কই গেলি। আশেপাশেই ছিল রাধা। জ্ঞানদার হাঁকে ছুটে আসতেই জ্ঞানদা ঝাঝিয়ে উঠল, কেবল বার-মুখো। উনুনটা একটু পোস্কের কর্।

রাধা রান্নাঘরে ছুটে গেল তৎক্ষণাৎ। পালান বসে ছিল ঘরের এককোণে। সে মামীকে দেখেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। নাকিয়ে নাকিয়ে কি যেন বললো। বঁটি পেতে কুড়িয়ে আনা কচুশাকগুলো কুটতে কুটতে জ্ঞানদা হুংকার ছাড়লো,—কেবল খাই খাই। পেট না রাক্ষস। খাবি খাবি, সব খাবি। মা-বাপ খেয়েছিস এবার আমায় বাকী। শাক ক'টা হুড়বড়িয়ে কেটে রান্নাঘরে ঢুকল জ্ঞানদা। হটকা মেরে মেয়েকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, থাক্ তোকে আর কষ্ট করতে হবেনা।

ভয়ে ভয়ে রাধা রান্নাঘরের চৌকাঠের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মায়ের এই হঠাৎ রাগের কোনো সংগত কারণ খুজে পায়না। জ্ঞানদা উনুনে আঁচ দিতে দিতে মুখে তপ্তকথার ফুলঝুরি ছোটায়। মেয়ের কেবল গায়ে ফু'দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো। এদিকে বুড়ো বাপ আসছে সারাদিন খেটে একপেট খিদে নিয়ে। যদি বাপের দুঃখ বুঝতো। কোথায় পা ধোয়ার জল আন্‌বে একটু বিছানাটা পেতে রাখবে, তা নয়,—কেবল রাজ্যি রাজ্যি ঘুরঘুর ফুরফুর।

চোখের কোণে জল এল জ্ঞানদার। বুড়ো মানুষ। সারাদিন তো বকা-ঝকার উপরেই চলছে। বোঝে সব জ্ঞানদা। কিন্তু, বুঝেও কিছু করতে পারে না সে। পোড়া পেটের জন্যেই তো এতসব। চাল। দুমুঠো চালের জন্যেই তো সংসারে এত খিটিমিটি।

ঝাঝারিয়া হড়বড়িয়ে নামে উঠোনে। ততক্ষণ বোলতার চাকের মত একঝাক লোকের ভীড়ে গুদাম ঘর ভরে গেছে। সবাইকে দুপাশে সরিয়ে সে

এগিয়ে এল। হট্টগোলে কোনো কথাই তার কানে আসছিল না। চিৎকার করে সবাইকে থামাল। মেঝের দিকে একবার তাকিয়ে গুদামের নেপালী দারোয়ানটাকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? সব শুনলো সে।

সূর্য হেলেছে পশ্চিমে। আর গোটা কয়েক বস্তা তোলা বাকী আছে। বিপিন কাঁধে একটা বস্তা ফেলে এগিয়ে এল গুদাম ঘরের দিকে। মনটা তার বেশ হালকা হয়ে এসেছে। দিব্বি দু'মণি চালের বস্তা কাঁধে ফেলে হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছেনা।

হঠাৎ গুদাম ঘরের কাছে এসে পা হড়কে পড়ে গেল হুড়মুড়িয়ে। অবশ্য দোষটা পুরোপুরি তার নয়। কুপীর মত ধোঁয়াটে সূর্যের নিস্তেজ আলোয় সবকিছু নজরে আসে না। তায়, জলে কাদায় উঠানটা বোয়ালমাছের মত পিছল।

একটা অর্ধোস্পষ্ট জান্তব আর্তনাদ করে সে মুখ থুবড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল ঝাঝারিয়া। ছুটে এল গুদামের নেপালী দারোয়ানটা। এবং আরো অনেকে। অল্পক্ষণের মধ্যে লোকে ঝাঝারিয়ার মাল-গুদাম ভরে গেল।

বিপিন পড়ে রইল একঠায়। উবু হয়ে। দুমণি চালের বস্তাটা হট করে যে ঘাড়ের ছোট্ট শিরদাঁড়াটা ভেঙে দেবে একথা বিপিনও ভাবতে পারেনি। চাল। চাল। একরাশ চালের ভিতর থেকে ঠেলে ওঠা তার নিস্পন্দ একজোড়া চোখ হাজার চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে কাকে যেন খুঁজছিল। আর, শীর্ণ প্রসারিত বাহুর উপরে আশ্লিষ্ট হাতদুটো তখনো আশ্চর্য নিবিড়।

ভরসন্ধ্যায় একপেট বোঝাই মাল নিয়ে বজবজের মালট্রেনটা সারা বস্তির হাড় কাঁপিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল।

॥ দ্বিজ ॥

পাটুলির খাল ঘেসে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা সড়কটি গেছে বেগমপুর নাগাৎ। দক্ষিণে দিগন্তজোড়া অনাবাদী জমি। দশ বছরেও গরুর খুরের দাগ পড়েছে কিনা সন্দেহ। শুধু হোগলা শালুকের বাদা। পাটুলির খাল পিছনে ফেলে এক ধুধু উত্তরে এগুলেই বেগমপুর। জামবাটি আকাশের নীচে ঝিমুচ্ছে নেশাখোরের মতো। চটকা-ঘোড়া নিমগাছের আবডালে রয়েছে লুকিয়ে-চুরিয়ে। সামনের দিকে রশিটাক বাড়লেই চোখে পড়বে সনাতন মণ্ডলের কুঁড়েটি। খড় কঞ্চি বাঁশ মাটির নড়বড়ে এক চিল্‌তে দাওয়া। এতটা শূন্যতা পেরিয়ে অনেকটা হোচট খাওয়ার মতো থমকে দাঁড়াতে হবে। আর সবচেয়ে অবাক করে দেবে পূব পাশের তেঁতুল গাছটা। নিষ্পত্র গাছটা রোম ওঠা ঘেয়ো কুকুরের মতোই বিশ্রী। চারি দিকে এক রাশ সবুজের নিবিড়তায় এ যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম বেঠিক বেবন্দেজ।

এই গাছটাই সনাতনের কাল। না পারছে গিলতে না পারছে উগ্‌রোতে। শনি ঠাকুরের মত পুরো ছ'টি বছর সতর্ক পাহারা দিয়ে চলেছে সনাতনকে। অমন ফুলে ফেঁপে ওঠা শরীরটাকে দিয়েছে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে, চিক্কলগুড়ি-হাতের মাংসল পেশীগুলোকে দিয়েছে চুম্‌সে, অমন খোদাই করা জলজলে চোখের রোশনাই নিবু নিবু প্রদীপের মতো ঘোলাটে অস্পষ্ট অর্থহীন।

পুরো ছ'টি বছর। বর্ষার জলে শাওলাপড়া দাওয়ায় বসে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টেনে চলেছে সনাতন। বিন্দে পিসীর দয়ার দান দু'বেলা দুমুঠো ভাত। আর সারাদিন হিজিবিজি ভাবনা। ধনুকের ছিলার মত দোমড়ানো শরীরটা দাওয়ার খুটিতে এলিয়ে পিটপিট করে চারদিকে তাকায় সনাতন। কোন দৃশ্যেই তার চোখ স্থিরবদ্ধ হয়না। বুকের ভিতরের যন্ত্রণা ঠেলে বেরোতে চায়। কখনো মাথা নিচু করে সনাতন ঘন ঘন শ্বাস নেয়।

তারপর হঠাৎ কখন অস্থির চোখদুটো বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে গেঁথে যায় তেঁতুলগাছটার সংগে। সারাটি সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে নাগাৎ।

গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ্দুর পেরিয়ে, বর্ষায় রোয়াধানের সময় ছাড়িয়ে, হেমন্তের দুধশীষ ধানের সুবাস'এর পরে আমেজ মাখানো শীতের ভোরে মহাজন বুদ্ধিশ্বর গোলদারের খামার যখন পাকাধানে ম'ম', চোত মাসের গাজনের মেলা যখন বসে পাটুলির খাল ঘেসে, তখনও মাটি ঠেকানো দাওয়ার আধো অন্ধকারে বসে বিরামহীন ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টেনে চলে সনাতন।

সারা গেরামের চাষাভূষো কামিন-কামলার আড্ডা এই সনাতনের দাওয়ায়। এক ছিলিম তামাকে মেজাজ শানিয়ে নেবার জন্যে। ভোর থেকেই গুটিগুটি লোকজনের ভীড়। চাষাভূষো ইস্তক মাটিকাটার দল। কথাবার্তায় সনাতনের দাওয়া মসগুল; কাক না ডাকতেই। ফসল থেকে ফকির চাচার মাদুলি যায় গাজনের মেলার পাঁচমেশালী গল্প। সনাতন নির্বাক শ্রোতা। বোকার মতো কথা গেলা আর ঘাপটি মেরে বসে থাকাই কাজ তার এই আসরে।

সবাই পাগল ঠাউরেছে ওকে। নইলে এমনি ধারা বসে থাকা মরদ মানুষের পোষায়? সেদিন হচ্ছিল গাজনের মেলার কথা। সনাতন হক-চকিয়ে ওঠে। গাজনের মেলা—?

……হ্যাঁ, গাজনের মেলাই তো বটে। তবে আজ পুরো সাতটি বছর আগের কথা। সবেমাত্র বিয়ে করেছে সনাতন। বৌ লক্ষ্মীমণি। ভারী লাজুক। মুখ তুলে কথা কইতে পুঁই ডাটার মত নুইয়ে পড়ে। তার মান ভাঙাতে অনেক কসরৎ করতে হয়েছিলো। গাজনের মেলা থেকে কেনা এক গাদা চুড়ি জোর করে পরিয়ে দিয়েছিলো লক্ষ্মীমণির হাতে। মুচকি হেসে ঘরবউড়ির মতো মৃদু তর্জন করেছিলো বউ: এত পয়সা খরচ করতে কে বলেছ্যালো তোমায়?—প্রতিপক্ষ শুধু নির্বাক নিশ্চুপ হাসির দমক ছড়িয়েছিলো ক্ষণিকের জন্যে। তারপর বাইশ বছরের দুর্বার যৌবন-দৃপ্ত একজোড়া সবল বাহুর বলয় টেনে এনেছিলো লক্ষ্মীমণিকে বুকের মধ্যে।—

বাঁ দিকের কপালের রগটা ফুলে ওঠে টন্‌টন্ করে। চোখ দুটো জলে জলে ঝাপসা। কাদায় আটকা গরুর আর্তনাদের মত একটা দীর্ঘ-শ্বাস বেরিয়ে আসতে চায়—ঠেলে ঠেলে। হাত দুটো খুঁজে বেড়ায়, হুকো-কল্কেটা। তামাক টান্‌তে টান্‌তে হাপুস চোখে তাকায় চারিদিকে ডাইনে-

বাঁয়ে। কখন হঠাৎ চোখ দুটো গেথে যায় তেঁতুলগাছটার সংগে। চোখের সামনের সমস্ত আলোর রঙ ফ্যাকাসে হয়ে আসে। আর দেখতে পায় না সনাতন।

সেদিন সাঁঝসকালে উঠে তাজ্জব বনে যায় সনাতন। নেড়া গাছটায় কচি কচি পাতার সমারোহ। যেন কেমিকেলের হার পরে হাস্‌ছে ফিক্ ফিক্ করে। এমন সুন্দর করে গাছটাকে আগে দেখেনি কোনদিনও সনাতন। বোড়া সাপের মতো তিন বাঁকের শেষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সনাতন নিষ্পলক তাকিয়ে। বোধহয় ভালোবেসে ফেলেছে গাছটাকে। নইলে এমন একটা দুর্নিবার মোহ, একটা হতচকিত রোমাঞ্চ শিহরণ তার চোখের দৃষ্টি আর মনের সামনে দেয়াল গেঁথে দেবে কেন?

কথা হচ্ছিল পাটুলির খাল নিয়ে। মজা খালে মাটি কাটা হবে। কচুরি আর সাঁচি হেলেঞ্চার সংগে চলবে খন্তা-কোদালের পালোয়ানি। গঞ্জের ঘাট থেকে বেগমপুর নাগাৎ জল চলাচল্‌তির পথ খোলসা হবে। কেরায়া আর ঘাসি নৌকার নির্বিবাদ বিচরণ মুখর করে তুলবে মাদারদহ ইউনিয়ন বোর্ড অফিস। ঘাট বাবুর খড়ো ঘরে জমবে লোকের ভীড়। সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচে। বর্ষার এক হাটু আটকা জলে বোয়া ধান ভেসে যাওয়ার ভয় নেই। দশ বছরের অনাবাদী জমিতে পড়বে গোরুর খুরের দাগ। লাঙলের ফালে চষা সোঁদা মাটির গন্ধ পড়বে ছড়িয়ে। গঞ্জের হাটে চালের গুদামগুলো হবে ভর-ভরন্তি।

...... গঞ্জের হাট? সেবার নতুন বিয়ে করে ফিরছিলো সনাতন। সংগে রাঙা বৌ লক্ষ্মীমণি। পাটুলিতে তখন ভরা জোয়ার। গলুই-এর ফাঁক দিয়ে লক্ষ্মীমণির চাতক চোখ দুটো গিয়েছিলো ঘোলা জল ডিঙিয়ে। হলদে আগুন সরষে ক্ষেত আর হাওরের পদ্ম ফুলের দিকে।—

—বিকেলের পড়ন্ত রোদ-এর কানামাছি। বাঁশ বনের খটাখট আওয়াজ। চটকা গাছের উদ্বাহু ডানাগুলো কেমন যেন বে-পরোয়া। হাত থেকে হুঁকোটা নামায় সনাতন। তারপর ঘোলাটে চোখদুটো ঘুরতে থাকে বৃত্তাকারে—ডাইনে বাঁয়ে। হঠাৎ কখন গেঁথে যায় তেঁতুলগাছটার সংগে।

এইতো সেদিন বেশ একটা মৃদু অস্থিরতায় গরম হয়ে ওঠে সনাতনের দাওয়া। ছিলিম ছিলিম তামাক আর বুদ্ধিশ্বর গোলদারের চৌদ্দপুরুষকে শাপান্ত হতে থাকে। বেটা শকুন। কেঁচোর মতো অন্যের গর্ত খুড়বার

গোঁসাই। সহ্য করবে না প্রাণকেষ্ট-সুভাষের দল। পিসিডেন্ট বাবু আর গোলদারকে থোড়াই কেয়ার করে তারা। মগের মুল্লুক পেয়েছে ব্যাটারা! এক হাত দেখে তবে ছাড়বে। এক গোটা ধান শহরে পাচার করা চলবে না।

…… …… পাচার করা চলবে না? আৎকে ওঠে সনাতন। বেশ মনে করতে পারে সেবারের মামলার কথা। রোয়া ধান ডাগর ডাগর। মায় নিড়ানীও শেষ। এমন সময় গোল বাধাল ব্যাটা! মাটি কাটাতে বদ্‌লা চাই। সবাইকে নামতে হবে গোলদারের ভেড়ির কাজে। রুখে দাঁড়ায় সনাতন। সবাই এককাট্টা! জান কবুল! সময় কালে বীজ ধান পুততে না পারলে সারা বছরের খোরাকী মিলবে কোত্থেকে? মাগপুত নিয়ে উদোম উপোস। না, কেউ যাবে না। গোলদারও কম পাত্তর নয়। ভেড়ির মুখ কেটে নোনা জল জমিনে ঢুকিয়ে, ভিন গা থেকে বদ্‌লা এনে, হাটে বেবুঞ্জে বসিয়ে, খালের পথ বন্ধ করে তবে ছাড়ে সে। সনাতনের দলও পিছপাও নয়। যুগ্যি জবাব দিতে জান পরোয়া করে না। নালা কেটে জমিনের জল বের করে দেয়। জোয়ান মরদের কোদালীর ঘায়ে বন্ধ্যা মাটি ফেটে তুবড়ে যায়। হয়ে যাক বোঝাবুঝি। তবু বদলা খাটবে না তারা। দুটো রূপোর চাকত্তির জন্যে বিকিয়ে দেবে না সারা বছরের মুখের গ্রাস।

কাজকাম বেবাক খতম। জটজটলায় কি হবে শুনি। দিনরাত্তির কেবল জোটন জোটন ঘুরে বেড়ানো, যতরাজ্যের গুজুর গুজুর। কাজ নেই, অকাজের ঢেকি। এসব ফষ্টি নষ্টি বরদাস্ত করে না লক্ষ্মীমণি। হক কথায় আবার ভয় কিসের? মহাজনের সংগে গোলমাল ভাল নয়। ফকিরের উপর কেরামতি! দুটো দিন না হয় খাটাই গেলো। বাইশ বছরের জোয়ান, দেহে তখন উত্তাল রক্তের উদ্দাম বন্যা। ঠাস করে একটা চড় কষাতে ভুল হয় না সনাতনের। সব ব্যাপারে মেয়ে মানুষের কি কাজ? ঘোমটা টেনে চাটাইয়ের এক কোণে বসে কেঁদেছিল লক্ষ্মীমণি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, সারারাত। রাগ পড়লে বুকটা পুড়ে পুড়ে উঠেছিল সনাতনের। একটা তীব্র অনুশোচনা ক্ষত বিক্ষত করেছিল তার মনকে।

সন্ধ্যের ফিকে অন্ধকারে দাওয়ায় শরীর ডুবিয়ে ডান হাতটা তুলে ধরে চোখের সামনে। কি যেন খোঁজে সনাতন। হঠাৎ ভূতেপাওয়া রোগীর মতো চেঁচিয়ে ওঠে। দক্ষিণের বিল থেকে উঠে আসা ঝির ঝিরে

ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত শীত করে সনাতনের। চোখ দুটো বুঁজেও স্বস্তি নেই। রাতজাগা পেঁচার মতো গজরায় সনাতন। তেঁতুল গাছের পাতায় শন্‌শনে কান্নার আওয়াজ। শেষ বারের মতন তাকায় সে ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে। ডাইনে বাঁয়ে। কখন হঠাৎ চোখ দুটো গেঁথে যায় গাছটার সংগে।

কাক না ডাকতেই সনাতনের দাওয়া ভরে ওঠে। কথাবার্তায় একটা উগ্রতা, একটা চাপা চাপা ভাব। গেরামে লুটিশ দিয়েছে গোলদার। হাটে বসতে হলে তোলা দিতে হবে। তোলা না হাতি! চ্যাং বিন্দির ছাওয়াল আবার সুলতান খাঁ। বেচাকেনা মন্দা। তায় ঘাসের ওপর শাকের আঁটি। ব্যাটা শকুন! তেতে ওঠে ওরা।

সেদিন সনাতনের পক্ষেও তেতেওঠা অস্বাভাবিক হয়নি। টো টো করে মেজাজ গেছে খিঁচড়ে। ভেড়ির কাজ চলছে পুরোদমে। সনাতনও মরিয়া। গেরাম ছেড়ে ভাড়া বদলায় ক'দিন চলে? গোলদার ভিন্ন পথ ধরে। সনাতনের কব্জি ভাঙা চাই। শিকড়ে ঘা দেয় গোলদার। লোক লাগায় সনাতনের বাড়ী। ঘাটে পথে ডোবায় কোথায় দুদণ্ড স্বস্তিতে বসবার জো নেই লক্ষ্মীমণির। ফেউদুটো অষ্টপ্রহর ঢু ঢু। খবরটা ছড়িয়ে যায় বাতাসের আগে। সাত মুখে সাত কান! সারা গাঁ কুখ্যাতিতে রি রি। সনাতন তেতে ওঠে ভেতরে ভেতরে।

একেই মন মেজাজ খারাপ। তায় এত আদিখ্যেতা। স্বামীভক্তি না হাতি! তেঁতুল গাছের গোড়ায় খামাকা পিটুলির আঁক দিয়ে লক্ষ্মী-পূজোর এমন কি দরকার পড়েছিল শুনি? চাল্ নেই চুলো নেই জুতো পরার সখ! রেগে ছুড়ে ফেলে সনাতন কুলো ভর্তি ধান আর এয়োরির কুলুঙ্গি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।—

মেরুদণ্ডটা শির শির করে। বাঁকা ধনুকের মতো দেহের ছিলাটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে চায়। বাঁকানো গোড়ালীর ওপর ভর করে উঠে দাঁড়াতে চায় সনাতন। সমান্তরাল হাত দুটো মুহূর্তের জন্য সোজা হয়ে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে। ধপ করে বসে পড়ে। উঠে দাঁড়াতে পারে না সনাতন। শুধু একজোড়া অসহায় ঘোলাটে ক্ষুধার্ত বোবা চোখ বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে ডাইনে-বাঁয়ে। হঠাৎ কখন গেঁথে যায় তেঁতুল গাছটার সংগে।

সন্ধ্যার দিকে জমে দু'চারজন। ছাড়া ছাড়া। তেমনি আসর

জমে না। থমথমে ভাব। চোখে মুখে পরাজয়ের চিহ্ন। খালের জলে বাঁধ দিয়েছে গোলদার। জমিজিরেত কাঠশুকনো খাঁ খাঁ। সনাতন কিছু ঠাহর করতে পারে না। বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। চাপা ব্যথাটা ঠেলে ঠেলে উঠতে চায়। চোখের কোণে নোনা জলের বান ডাকে। দুকূল ছাপিয়ে নেমে আসে চিবুক পর্যন্ত। ভয় ভয় করে সনাতনের।

তা' ভয় পাবারই কথা। ঘুরঘুটি অন্ধকার ঠেলে এগুলো। বাদার জ্যাবজেবে গন্ধ। জোলো জোলো। সেই স'তসকালে বউড়িকে পিটিয়ে বেরিয়েছে। সারাদিন টো টো করেছে বাড়ী বাড়ী। রাত দু'প্রহর—। হঠাৎ হোঁচট খায় সনাতন। পা-টা থেৎলে গেছে। সুদাসের বাড়ী পেরিয়ে ঘোড়ানিম গাছতলায় আসতেই মন কেমন করে সনাতনের। কপালের রগদুটো দপদপ করে। পাদুটো দশমণি ঢেকির পাড়। চলতেই চায়না। উঠানের দিকে এগিয়ে আসে। পিদিম জ্বলছে না ঘরে। ব্যাপার কি? রাগ করে বাপের বাড়ী চলে গেল না তো! দাওয়ায় উঠে দরমার বেড়া ঠেলতেই হুড়মুড় করে পড়ে যায় সনাতন। রাগ হয় তার। উঠে দাঁড়ায়। নেমে পড়ে উঠোনে, তেঁতুল গাছটার নীচে। অমন রাগে বয়ে যায় সনাতনের। হঠাৎ বাদুর ঝোলার মতো একটা ডাল ছটকা মেরে সরিয়ে দেয় সনাতনকে। ব্যাপারটা ঠাহর করতে পারে না সে। সাদা রকমের কি একটা নড়েচড়ে উঠে। কাপড়?—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাপড় বৈকি। তবে শুধু একটা কাপড়ই নয়। একটা দোদুল্যমান লাসও বটে। আর সে লাসটা লক্ষীমণির।—

কেঁপে—কঁকিয়ে ওঠে সনাতন। গোলদারের শত্রুতা, না সনাতনের নির্যাতন—কোনটা যে লক্ষীমণির সে মৃত্যুর কারণ বলা যায় না। আর বলা যায় না বলেই হয়তো জোয়ান মরদ সনাতনের এই দশা। তেঁতুলগাছ আর ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক, অমন লোহাপেটানো শরীরে এনে দিয়েছে পক্ষাঘাতের বীজ।

অস্পষ্ট বোবাদৃষ্টি মেলে তাকায় সনাতন ডাইনে-বাঁয়ে। গোলদারের খামার বাড়ীর জামগাছটা বেয়ে লকলকে আগুনের লুকোচুরি। সাপের মতো বেঁকিয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। আগুনের ঝলকে সনাতনের মুখটা বীভৎস দেখায়। ছ'বছরের মরা গাঙে বান ডেকেছে নাকি? বন্যা আসবে তাহলে? ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে যায়। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় সনাতন।

সুদাস ছুটে আসে। রাত্রেই খবর দেয় সনাতনকে। চোত মাস, খটখটে শুকনো ধানের গাদায় হঠাৎ আগুনের ছোঁয়াচ। তারপর গ্রাস করেছে গোলদারের খামার আর সাতপুরুষের ভিটেটি।

শেষ রাতে ঝিরঝিরে হাওয়া দেয় দুবুক পুড়িয়ে। সনাতন কুড়ুলটা নিয়ে বেরিয়ে আসে। হাতের পেশী দুর্বার হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড আঘাতে তেঁতুলগাছটা ঠকঠক করে কাঁপে। তিরিশ বছরের দোমড়ানো দেহে বাইশ বছরের জোয়ান মরদের দুরন্ত শক্তির উন্মত্ততা। প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ভোরের উকিঝুঁকি রোদ্দুরের কানামাছিতে উঠান আলোয় আলোময়। সুদাস অবাক হয়ে যায়। ব্যাপার কি? লোকটা পাগল হয়ে যায়নি তো! সনাতন হেসে নেয় এক ঝলক প্রসন্নতায়। হবে আবার কি? দিলুম শালারে শেষ করে। কাজকাম না করলে বাঁচবো কি করে।

॥ পাণ্ডুলিপি টীকা ভাষ্য ॥

সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই সে দেখল গা পুঁড় যাওয়া জ্বরে তন্দ্রার ঘোরে চোখ বুঁজে পড়ে থাকার সময় চতুষ্পার্শ্বের প্রখর আলো যেমন অবাস্তব মনে হয় তেমনি আলোয় ঘর ভেসে যাচ্ছে। পায়খানায় ঢুকে পরপর দুটো 'চারমিনার' ঠোঁটের ডগায় পুড়িয়ে গতদিনের সকাল দুপুর সন্ধ্যা এবং রাতের ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতিগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেও কোষ্ঠকাঠিন্যের নিরসনে ব্যর্থ হয়ে কলতলায় এসে ঘাড়ে থাবড়ে থাবড়ে নিদারুণ বিরক্তিতে চোখে মুখে থুতনিতে সে বেশ করে খানিকটা জল ছিটিয়ে দিল। চল্‌টেওঠা ভগ্নবাহু জল-বসন্তের গুটি শুকিয়ে যাবার মত ছিট ধরা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ওয়াক থু করে জিভের ডগা কণ্ঠনালী এবং উদোম পাকস্থলীতক চিলিক মেরে ওঠা তেতো চা সম্মুখস্থ বারান্দায় এলোপাথাড়ি পা ছড়িয়ে বসা দৈনিক কাগজে ঘাড়গোজারত বাবার দিকে চোখ পড়তেই উগরে দেবার যারপরনাই ইচ্ছাটা চেপে সে গমগম করে ঘরে ঢুকে পড়ল। সিঁড়ির নিচেকার ক্রমশঃ ঢাল হয়ে আসা অপ্রশস্ত এই ঘরের সিমেণ্টচটা মেঝে, চারিদিকে যদৃচ্ছ ছড়ানো গতরাত্রের দগ্ধশেষ সিগ্রেটের টুকরোগুলো, ইতস্ততঃ ক্ষিপ্রচারী আরশোলার উচ্চাবচ গতি এবং দক্ষিণের জানালার ওপাশে প্রতিদিনকার মতই দৃশ্যমান মাঝবয়সী বিধবা মেয়েলোকটির কাঁধের কাপড় আলগা করে ঘনঘন মাংসল বাহুমূল থেকে পেটের পেটি অব্দি দুর্গানাম জপের মত বিড়বিড় করে কলতলায় চাতালে বসে অবিরল জলঢালা আড়চোখে দেখে সে কবিতা লিখতে বসে ভাব-ভাষা-ছন্দের দৈন্য বা প্রেরণা-হীনতায় কাগজের ওপর হিজিবিজি আঁকিবুকি কেটে নিজের অনবধানতায় একটা কিমাকার ছবি এঁকে তুলবার মত বিরক্তিতে ঘরময় পায়চারী শুরু করে দিল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে তার বুকের ডানদিকে মাঝখানে বা পার্শ্বস্থ কোথাও অসাবধানতায় খুরে চিবুকের কোনো একটা অংশ কেটে যাবার মত একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল।

শীতের দুপুরে এ ঘরটা অসহ্য, আলোহীনতা বা ভ্যাপ্‌সা বা ময়াল সাপের পেটের ভেতরকার দ্রব শীতলতার জন্যে নয়। এখন বেলা ঠিক সাড়ে বারোটা

বা তার কিছু বেশিও হতে পারে, সময় এখন চাতালের পিচ্ছিল রোদ্দুর বা দূরশ্রুত রেডিও'র সারং-এর পর্দায় বাঁধা। মা সম্ভবত এখন এই মুহূর্তে অবসন্ন ভঙ্গীতে পাশের ঘরে মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে টুটুলকে নিয়ে আধবোঁজা চোখে বিমর্ষ শীতের দুপুরটাকে অর্ধধ্যানতায় লেহন করতে করতে কোন অতীতের সুখস্বপ্নে মশগুল। সুখ—সুখ—সুখ। তা হয়না, হতে পারেনা। জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দিরের চাপা গন্ধের মত ভ্যাপ্‌সা সুজনিটাকে মাথা থেকে বুক অব্দি ছড়িয়ে নিয়ে দক্ষিণের জানলা ভেদ করে হু হু করে ছুটে আসা দেয়ালের গায়ের রোদ্দুরের বিবর্ণ আভা দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ আগেকার টুকরো টুকরো স্বপ্নগুলোর কথা মনে পড়তেই বুকের ভেতরে একটা দগ্‌দগে প্রদাহ, খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার প্রবল ইচ্ছায় বিষণ্ন পাখীর মত তীব্র বেদনা সে অনুভব করল। তার স্বপ্নগুলো এইরকম, যা সে বুকের প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অবিকলভাবে ভাবতে পারে, এমনকি মনে মনে কয়েকটা জলরঙের স্কেচ এঁকেও বুঝিয়ে দিতে পারে—

১ নং ছবি—তার ছেলেবেলার স্কুলে যাবার পথের ছবি। কুদঘাটা পেরিয়ে ডানদিকের খালটা ছাড়িয়ে বাতাবী লেবু গাছতলায় জীবনে প্রথম ধানক্ষেতের উদ্দামতা নিয়ে দেখা সেই মেয়েটি, যার হাঁটু অব্দি ঢাকা ফ্রক, শ্যামলা রোগা দুটো পা, লঘাটে ধরনের মুখের আদল এবং প্রথম বর্ষায় ফোটা জুঁইফুলের ঝিরঝিরে হাসির মত যার দুটি চোখ।

(এবং যাকে সে কলকাতার চলতি ভিড়ে কখনই দেখতে পাবেনা, যেহেতু আজ এতগুলো বছর পর সে হয়ত অমুক চন্দ্র অমুকের পাঁচটি সন্তানের রত্নগর্ভা হয়ে নোনাতলা, ঢাকুরে বেলেঘাটা বা নদীয়ার কোন এক উদ্বাস্তু কলোনীতে রক্তাল্পতা সূতিকা অম্লশূল বা এবম্বিধ কোন প্রতাপান্বিত রোগের আশ্রয়ে কালাতিপাত করছে।)

২নং ছবি—আদিগন্ত মাঠের পাড় দিয়ে বয়ে যাওয়া সূর্যের মত প্রখর নদীর কোল ঘেসে দরমার বেড়া টালীচাল পূর্ববঙ্গের তাদের সেই স্কুলঘরটি। যেখানে তার অনেক বর্ণময় কামনা এবং ছোটছোট সুখদুঃখগুলি এখনও মুক্ত আকাশের নিচে সারবন্দী হয়ে শুয়ে আছে—

(এবং সেই স্বপ্নের চেয়ে অনন্ধ, সন্তান শোকের চেয়ে সন্তানের শুশ্রূষার হৃদয়বিদারক স্মৃতির মত রমণীয় স্থানে সে কোনোদিন কোনোক্রমে ফিরে যেতে পারবে না।)

আর এইসব ছবি ভাবতেই তার বুকের ডানদিক বাঁদিক মাঝখানের বা পার্শ্বস্থ কোন একজায়গার ব্যথাটা হু হু করে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তাকে ক্লান্ত করে ফেলতে চায়। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে দক্ষিণের জানালার ওপাশে মরা রোদ্দুর, কলতলার চাতালে ঝিলমিল করে ওঠা পেয়ারা গাছের ঈষৎ আন্দোলিত পাতার উচ্চতাহীন ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে জীবনের এতগুলি অকৃতার্থ বছর বয়ে যাওয়ার অনুশোচনায় চোখের ওপরের পাতাদুটো শুকনো কুল বা জলেধরা মুড়মুড়ে পুরোন বইয়ের লাল পাতার মত সংকুচিত হয়ে ওঠে।

দুপুরের মধ্যভাগে সেই অচিহ্নিত ব্যথাটা তাড়াবার জন্য সে তড়িঘড়ি ঘর ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়ে। লেকের ধারে গাছগাছালির আড়ে বা পার্কের নির্জনতায় বা সৌভাগ্যবশত কোন পরিচিত বা অর্ধপরিচিত লোকের সাক্ষাৎ পেলে সময়টাকে সে নয়াপয়সার মত ছড়িয়ে দেয়। বিশেষত, শীতের দুপুরে যতক্ষণ সে একা ততক্ষণ ধাবমান কলকাতা এবং তৎসহ নানাবিধ শব্দতরঙ্গ বা ত্রিতলমাত্রিক তাবৎ দৃশ্যযোগ্য বস্তুসকল তার আক্রান্ত চেতনায় বিন্দুতম উপদ্রবের সৃষ্টি ঘটাতে অসক্ষম। ক্বচিৎ ট্রামলাইনের তারে ঝুলন্ত ভাঙা রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘনায়মান প্রতিবেশকেই তার অর্থহীন এবং দূরস্থ স্মৃতির মত অবাস্তব বলে মনে হয়। পৃথিবীর যে একটা ঘূর্ণমান প্রমত্ত অস্তিত্ব আছে একথা ভাবতেও তার বড়ো বিস্ময় বোধ হয়। এবং সেই মুহূর্তে সামনের দিকে আক্ষিপ্ত ডবলডেকারের পুরু চাকার তলায় ঝাঁপ দিয়ে শেষরাতের অতিদীর্ঘ ভারবাহী মালগাড়ীর নিচেকার লাশের মত চিরসুপ্ত হবার কল্পনাকেও তার ভীতিপ্রদ বা রোমহর্ষ বলে মনে হয় না। কিংবা পকেটে দৈবাৎ কিছু রেজকি থাকলে ট্রামে চেপে সে সারকুলার রোডের মোড়ে নেমে লাউডেন স্ট্রীট ক্যামাক স্ট্রীট থিয়েটার রোড বা হারিংটন স্ট্রীটের ভেতর দিয়ে মজা বিকেলের লাল আভা চোখে মুখে মেখে একটা অস্ফুট গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে কান্নার মত আবেগে নিদারুণ অর্থহীনতায় দুপাশের রাজকীয় বাড়ীগুলির স্থাপত্যে মুগ্ধ হয়ে ট্রামলাইন পেরিয়ে ভদ্রতা-রক্ষার চেয়েও অস্বস্তিকর চিন্তাগুলিকে হটিয়ে দেবার চেষ্টায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল রেঞ্জার্স ক্লাবের তাঁবু বা ইতস্ততঃ সঞ্চয়মান সন্ধ্যার জন্যে উৎকণ্ঠিত নষ্টমেয়ের পাশ দিয়ে চলতে চলতে পশ্চিমের প্রগাঢ় সূর্যের অবিশ্বাস্য পতনের সাক্ষী হতে হতে কোনো ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ঘরসংসার করবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে বা বিত্তপ্রশ্রয়ী একটা চাকরী পাবার কল্পনায় নতজানু হয়ে সবুজ ঘাসের মখমলে বসবার প্রবল ইচ্ছায় যখন সে অধীর হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই তার মনে

হয় মাথার ওপরকার গম্বুজাকৃতি সংকেতহীন আকাশ অদূরের বিচূর্ণপ্রায় মনুমেণ্ট বা এস্‌প্ল্যানেডের তাসের ঘরের মত সাজানো ছিমছাম বাড়ীগুলো সমেত যাবতীয় মানুষ নির্জনতা এবং নিসর্গ সময়ের উচ্চণ্ড আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে তার অচিহ্নিত বুকের ব্যথাটা মাথার দু'পাশের রগের কাছে এসে স্থিরবদ্ধ হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়।

অনেক রাত্রে নির্দিষ্ট চায়ের দোকানে নির্দিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে যুগপৎ গম্ভীর তত্ত্বালোচনা এবং অনর্গল খিস্তি দেবার পর বাড়ী ফিরে মাথা গুঁজে খাওয়া শেষ করে সেই ক্রমশ ঢাল হয়ে আসা সিঁড়ির নিচেকার অপ্রশস্ত ঘরে ঢুকে বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে অনেক কিছু ভাববার চেষ্টা করতেই চারিদিকের উন্মত নীরবতায় তার ভেতরকার যন্ত্রণার মত অর্ধজাগ্রত বোধের মত ব্যথাটা কিলবিল করে উঠে তার দোমড়ানো দেহটাকে, তার বুকের বাঁদিককার ধুকধুক শব্দগুলিকে তার মাথার খুলির অভ্যন্তরস্থ অমসৃণ স্নায়ুগুলোকে ধীরে ধীরে নিস্তেজ করে ফেলে। আর তখন তার শরীরের ভেতরে ব্যথাটা তাকে সময়ের অন্ধকারে শুইয়ে রেখে সারা ঘরময় উল্লাসে নৃত্য করতে থাকে।

———

॥ ফল্গু ॥

কাক না ডাকতেই হাঁকাহাঁকি মোক্ষদার মুখ না যেন ফোটা খই। হরবকত্ কথার ফোয়ারা ছুটছেই। একটা ছুতো পেলেই হলো। সাতঘাটের জল একঘাটে। এক নাগাড়ে সেই এগারোটা। যখন পরাণ ফিরবে। ফিরি শেষ করে।

সাঁঝ-সকালে রাস্তার ধারে জলের কলের লাইন। সেখানে মোক্ষদার সর্বাগ্রাধিকার। কে আসবে অমন কথার সমুদ্দ্‌র ডিঙিয়ে আগে জল নিতে? ভয়ে সব গরুচোর। ট্যা ফোঁ করেছ কি বাস! অনর্গল কথার বেপরোয়া তুবড়ি।

জলভরা কলসীটা দাওয়ায় ফেলে চেঁচায় মোক্ষদা। পটলিটা গেল কোথায়? সকাল না হতেই নোটন নোটন ঘুরে বেড়ানো। বস্তির ডেঁপো ছুঁড়িগুলির সংগে যত রাজ্যের ফষ্টিনষ্টি। এদিকে মা বেচারা খেটে খেটে একসার। গলায় রক্ত উঠে মরছে।

পটল ছুটে আসে। ওঠে গলগলিয়ে। এত চেঁচামেচি কিসের? —ব্যস! বারুদে আগুন। শুধু দপ্ করে জলে উঠতে যা সময়। তারপর এলোচুলে রণরঙ্গিণী, এসব কে করে শুনি। তুই না তোর বাপ্? মুখে কাপড় গুঁজে ফিক ফিক করে হাসে পটলি। মার চরিত্তির জানা আছে তার। কিন্তু সইতে পারে না মোক্ষদা। মেয়ের বেলেল্লাপনা, তাচ্ছিল্য। সবাই বসে মারবে মণ্ডকা। আর যত কাজ সব বুড়ীর ওপর। শ্বশুর বাড়ীর মুখে নুড়ো জ্বালিয়ে মুখপুড়ী মায়ের ঘাড়ে। তাও যদি দুঃখ বুঝতো মোক্ষদার। পরাণ বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। এই সবে ঘুম থেকে ওঠা হল বাবুর। চোখ রগড়ে দয়া করে হাই তুললেন। রান্নার কদ্দূর? ছ'টায় চাম্পাহাটি লোকাল। মিস্ করলে মাঠে মারা যাবে একটা ক্ষেপ।

মোক্ষদা গলগলিয়ে ওঠে। কেরে আমার লাট বাহাদুর। এবার আমায় কেন? আমি এ সংসারে কে? খেতে নেই পরতে নেই শুধু খাটুনি। সুখ্যাতি করবে এমন জনও নেই। শুধু কাজ করো। পারবে না, পারবে না মোক্ষদা।

কথা যেন শেষ হতেই চায়না। দাওয়ায় পিঁড়ি পাতে পটলি। পরাণ খেতে বসে। শানকিটাক ড্যালা পাকানো ভাত। সংগে শাক চচ্চড়ী, ছাতা-মাতা। মেয়েকে উদ্দেশ করে বলে মোক্ষদা। পয়সা রেখে যেতে বল্। লালা মাল দেওয়া বন্ধ করেছে। এক ছিটে তেল নেই ঘরে। বলি, গতরের মাশুল জোগাবে কে? একদিকে রথের খাটুনি। তায় পয়সার চিন্তা। ক'দিক সামলাবে মোক্ষদা? হাত নেড়ে কালোয়াতি চালে খলবলিয়ে ওঠে পরাণ। ঘাবড়াও মাৎ। দুটো দিন সবুর করো। মহাজনের হাতে পয়সা আসলেই হলো। বিলকুল হোগা। রাজা বন্ জায়গা। মোক্ষদা মুখ বাঁকায়। হয়েছে খুব। পেটে নেই ভাত, বাবুর শখ জুতোয়। অমন পিত্‌লা শখের মাথায় ঝাঁটা। চেয়েচিন্তে বর্তে গেলেই যথেষ্ট। তায়—

পরাণ বেরিয়ে গেলে সব রাগ গিয়ে পড়ে পটলির উপর। ও মেয়ে নয়, পুঁতলে গাছ হ'ত।

বিষ্টি-বাদলার দিন। সারারাত টিপটাপ জল গড়িয়ে ঘরদোর টই-টম্বুর। ভাঙ্গা পলেস্তারার তাকে সামলে রাখা দুষ্কর।

একটু পরিষ্কার করলেও তো পারতো। কেবল রাজ্যি রাজ্যি ঘুর ঘুর ফুর ফুর। কাজে নেই কথায় বিশ পাহাড়ি।

এদিকে পানগুলো শুকিয়ে তামাকপাতা। নেই জল চুনের কৌটাটা মধুপর্কের বাটি। কাৎ হয়ে সব চুন গড়িয়ে পড়েছে।

রাগে রাগে দুটো পান মুখে পুরে দেয় মোক্ষদা। গাল না যেন টোপা কুল। কোন গালে পান ধরবার উপায় নেই।

খাওয়ার পাট চুকতে বেলা দুটো। এই সময় দণ্ডভর জিরিয়ে নেয় মোক্ষদা। দাওয়ায় মাদুর পেতে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে পড়ে থাকে। ঘুম নয় ঝিমটির মতো। সময়ের অলস রোমন্থন আর কি। এখন থামে বকবকানি। চুপচাপ কিছুক্ষণের জন্যে।

এই সময়টুকুই পটলির পুঁজি। দেদার খরচ করে নিশ্চিন্তে। বাড়ী পালিয়ে আড্ডা জমায় বস্তির আর দশজন ইয়ার বন্ধু—বেলফুল, যুঁইফুলদের সংগে। তাস, লুডো, রংমস্করা—হরেক রকম চেকনাই আসর।

কারখানায় চারটের সিটি বেজে উঠলেই হকচকিয়ে ওঠে মোক্ষদা। উঠে বসে। পাশের ঘরে বাজখাই গলার আওয়াজ শোনা যায় রামতারণের। পটলিকে ডাকে সে। এক গ্লাস জলের জন্যে।

ঝেঝিয়ে ওঠে মোক্ষদা: কেন, হাত দুটো কি ক্ষয়ে গেছে নাকি? একটু

কষ্ট করে নিজে নিলে-ও তো পার। একরত্তি মেয়েটাকে কেবল খাটাতে লজ্জা করে না মিন্সের।

রামতারণ ধমক খেয়ে বসে থাকে ঘাপটি মেরে। মোক্ষদার কথায় কোপ লাগাবার মতো শক্তি নেই আর তার আজকাল। আয় করছে না এক পয়সাও। রোজগারের মুখে ছাই।

অবশ্য এ-অবস্থায় চিরদিন ছিলনা রামতারণ। পাকিস্তানে থাকতে পয়সা ছিল হাতের ময়লা। জমিদারী সেরেস্তার আয় তার কম ছিল না। কিন্তু সবই অদৃষ্ট। ভাগাভাগির হরির লুঠে সে আজ দেশত্যাগী। ঠাঁই নিয়েছে বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে কসবার এই বোসপুকুর বস্তিতে। প্রথমটায় চেষ্টার কমতি হয়নি। কাজ খুঁজেছে। পায়নি। ঘটী-বাটী বিক্রি করে মেয়ে পটলিকে বিয়ে দিয়েছিল। মোটামুটী ভাল পাত্রের কাছে। কিন্তু পোড়া কপাল রামতারণের। কপালে নেই সুখ। স্বামীটা মাতাল। ফের আর একটা বিয়ে করে চম্পট দিয়েছে খড়গপুরে।

একরত্তি দুধের ছেলে পরাণের ওপর এতবড় সংসার। ট্রেনে ট্রেনে ফিরি করে ক'পয়সাই বা আসে।

তাই, গাল ঝাঁটা লাঠি গুঁতো ছাড়া আর কি থাকবে তার কপালে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল ডিঙিয়ে সন্ধ্যে। লাল সূর্যটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো কারখানার দেয়াল ঘেঁসে। কালোজামের মতো ঘুরঘুটী অন্ধকারের হাট নামলো বস্তির বুকে। ঘরে ঘরে উনুনের ধোঁয়া আর পিদিম জ্বালনোর পাট চলেছে। এঘরে ওঘরে ছেলেমেয়ের পড়াশুনার আধভাঙা গুঞ্জন। এঁদো পুকুরটায় কালো পর্দার ঝাঁপ। কাঁচা ড্রেনের পিত্তি গোলানো বদখৎ গন্ধ। ফিরতে লাগলো দু'চার জন করে মরদ, গুটিগুটি। বোসপুকুর বস্তি এখন হৈচৈতে সরগরম। হাঁসমুরগীর খোয়াড়ের মতো। কুয়োতলায় বাসন মাজার আওয়াজ। একটানা। ঘস ঘস চিন চিন।

ঘরে নেই ছিটে তেল। এবাড়ী সেবাড়ী মেগে জুটিয়েছে খানিকটা মোক্ষদা। সবে ঘুঁটে দেওয়া শেষ হলো। মায়ে-ঝিয়ে বসলো ঠোঙা বানাতে। তারপর অড়হর ডাল বেটে নিম্পির করা। কথা আছে লালা মুদীর সংগে। সের প্রতি বাটায় দু'আনা মজুরী।

শুধু কি ছেলের আয়ের ওপর সংসার চলে?

রাত বাড়ে, মোক্ষদাও তেতে ওঠে। চলে তর্জন গর্জন, ফোঁসফোঁসানি। ঘরভর্তি ধোঁয়া। রাত একহাটু। কাজকাম এগুলোনা কিছুই। চালটা

ধুয়ে দিলেও তো পারত পটলি। ওদিকে বুড়োটা ছটফট করছে। মশারীর দড়ি খাটানো হয়নি। অমন সোমত্থ মেয়ে যার ঘরে—তার বাপের সাতছিনদ্দি। মাথার ওপরে চন্দ্রসূর্য আছে। ধম্মে সইবে না।

সময় চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে। রাত বাড়ছে। ঘনতর হচ্ছে অন্ধকার। বোসপুকুর বস্তির সরগম কমে আসে ক্রমে ক্রমে। সব এখন চুপচাপ। থিতিয়ে পড়া জলের মতো। হৈ হুল্লোড় নেই এখন। বস্তিটা ভিরমি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে উদোম আকাশের তলায়। সবাই ফিরলো। শুধু পরাণ বাদে।

তা ফিরবে কেন, বুড়ী মাকে কষ্ট দেওয়া ত' চাই।

পিদিমটা জ্বেলে দাওয়ায় চাটাই বিছালো মোক্ষদা। পুঁই ডাটার মতো এলিয়ে দিলো শরীরটাকে। কখন আসে কে জানে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি। বুড়ো হাড়ে সহ্য হয় এসব? মাথায় কাপড় জড়িয়ে একটু চোখ বুজবে এমন সাধ্যি আছে? অমনি মশার প্যানপ্যানানি। ঝাঁকে ঝাঁকে। কাতারে কাতারে। দংগল বেঁধে আক্রমণ।

কখন হঠাৎ চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে মোক্ষদার। অন্ধকারে শরীর ডুবিয়ে পড়ে থাকে অচৈতন্যের মতো।

দশটার ট্রেন সিটী মেরে চলে যায়। ঘুম ভাঙে মোক্ষদার। চোখ দুটো ভারী ভারী। জোর করেও খোলা যায় না। টলতে টলতে কেঁপে কেঁপে কুপীটা তুলে ধরে সে। দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন একটা বলতে চায়। রাতজাগা পেঁচার মতো গজরায়। কই এলি পরাণ।—কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ফের কখন এলিয়ে পড়ে। বুস বুস করে। অনেকটা গোঙানীর মতো। আর সহ্য হয়না বাপু। সারাদিনের খাটুনি। বুড়ীমাকে ভুগিয়ে কতই না আনন্দ।—তারপর আর কোন কথা নেই। আপাদমস্তক কাপড়ে জড়ানো জড়পিণ্ড একটি। অন্ধকারের মধ্যে ঢিবির মতো দেখায়।

দূরে চলেছে মাতালের চীৎকার, বড় রাস্তায়। বজবজের ট্রেন শান্টিং করলো। এলোপাথাড়ী সাইকেল রিকসার টুং টাং শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল মোক্ষদার। দাওয়া ভর্তি একরাশ লোকে থৈ থৈ। চোখ রগড়ে উঠে বসে। ব্যাপার কি? এতরাত্রে—?

পরাণের সাংগপাংগ একগাদা বন্ধুবান্ধবের দল। বাপু, ট্রেনে ফিরি করা কি সহজ কাজ। গাড়ীর দরজায় ধাক্কা লেগে পা থেৎলে গেছে পরাণের। সে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল ঠক ঠক করে। ভয়ে কাঁচুমাচু। বন্ধুরা বুঝিয়ে বল্লে, তেমন কিছু নয়। গাড়ীর দরজায় ধাক্কা লেগে পা-টা থেৎলে গেছে একটু। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে। সেরে যেতে আর ক'দিনই বা লাগবে।

মোক্ষদা ফুলে উঠল। গলগলিয়ে চেঁচাল পাগলের মতো। পা কেটেছে, বেশ হয়েছে। তা আনলে কেন এখানে। তোমাদের আড্ডায় থাকলেই পারতো। অমন ছেলে মরলেই বা আমার কি।—তারপর পটলিকে উদ্দেশ করে বললো সে। নে ভাত দে ভাইকে। গিলুক কিছুটা। আমি পারব না। অমন ছেলের সাথে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। ভীড় পাতলা হলো। অবার সেই জমকালো অন্ধকার। পরাণ পটলি ঢুকেছে ঘরে. ভয়ে ভয়ে। অন্ধকারের মুখো-মুখি মোক্ষদা। বসে রইলো সে অনেকক্ষণ, বোবায় ধরা ঘুমের মানুষের মতো।

এত হাঁকডাকে পাশের ঘরের কুঞ্জবৌ বেরিয়ে আসে। ব্যাপার কি মাসিমা। এত রাতে হৈ চৈ কিসের। একবার সরিয়ে দেয় তাকে। তারপর দাওয়ার খুঁটিতে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলে মোক্ষদা: আর বলো কেন। ওই তো এক রত্তি দুধের বাচ্চা। পা কেটে একাকার! ও' ছাড়া মা' বলে ডাকবার আর আমার কে আছে বলো?

———

॥ দুই তরঙ্গ ॥

মাঝখানে রয়েছে এই ছোট্ট উঠানটি। এপাশে ঘোষবস্তি ওপাশে রায়বাড়ী।

এপাশে সারি সারি চোঙ্‌খোলার নিচু নিচু খুপড়ি ঘর। চারদড়য়ার আগল ঘিরে খানকতক ছোটখাট সংসার রয়েছে এখানে। কাক না ডাকতেই হৈহুল্লোড়ে সরগরম হয়ে ওঠে এপার। ঘুঁটে কয়লার দম আটকানো ধোঁয়ায় চলে এখানে একটানা কিচিরমিচির। চিলতে উঠানে চলে রাতের পর্বত-প্রমাণ এঁটোবাসন মাজার শব্দ। বিনোদ ফিরিওয়ালার স্ত্রী মোক্ষদা আর আইবুড়ো ধুমসী মেয়ে ক্ষান্তমণি পাল্লা দিয়ে ঠোঙা বানায় ছোট দাওয়ায় বসে। বাহাত্তুরে ছুতোর মিস্ত্রি রামতারণ হাতুরবাটালী নিয়ে ঠকাঠক করে। বানায় টেবিল, চেয়ার জলচৌকি আরো কতকিছু। তার দজ্জাল বিধবা সোমথ মেয়ে পাঁচি ঘুঁটে গুল দেয় কঞ্চিমাটির নড়বড়ে দেয়ালে। রিক্সাওয়ালা বুড্ডা বনোয়ারীলাল তোলা খাটিয়ার উপর বসে খৈনি টিপতে টিপতে গান ধরে—রামা হো।

ওপাশে গোলাপীরঙের ছিমছাম দোতলা দালানবাড়ী। ওখানে প্রশস্ত ঝকঝকে বারান্দায় ঝুলছে অগুন্তি অর্কিডের টব। মৃদু হাওয়ায় নড়ে নড়ে উঠছে কার্নিশ বেয়েওঠা পাতাঝিলমিল মর্নিংগ্লোরি আর ঝুমকোলতা। বিরাট কোলাপসিবল্ গেটের কাছটায় সতর্ক পাহারা দিয়ে চলেছে একটা স্বাস্থ্যবান বিলিতি কুকুর! ওখানে থাকেন রায়গিন্নী সুলেখা দেবী। একরাশ মিঠে হাসির তরঙ্গ তুলে গভীর তৃপ্তিতে সারাটা দিন কাটান তিনি রেডিও শুনে, সিনেমা দেখে, নাটক-নভেল পড়ে। ওখানে থাকেন রায়বাবু। চার-চারটে খুদে কারখানার মালিক। এতল্লাটের ডাকসাইটে বাসিন্দা।

এপার-ওপারের ব্যবধান শুধু এই ছোট উঠানটি। খোয়াওঠা ছড়ানো ছিটানো ঘাসে ভর্তি একফালি জমিটুকু দুটি জগতকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে কোনো রকমে।

এপারের পাঁচি আর ওপারের রায়গিন্নির মধ্যে বড় ভাব—খুব দহরম-মহরম। কি করে যেন কবে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে আলাপ-সংলাপ-সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে সে ইতিহাস জানা যায় না। তবে আঁচ করে নিতে কষ্ট হয় না। রায় বাবু কাজের মানুষ। কারখানা আর ব্যবসার ভিতরেই ডুবে থাকেন চব্বিশটি ঘন্টা। খাওয়া আর ঘুম বাদ দিলে অতবড় দোতলাবাড়ীর সীমাহীন অবসরের রাজ্যে দণ্ডতরে জিরিয়ে নেবার মতো ফুরসুৎ কোথায় তার। তাকে বাদ দিলে ভোরের মর্ণিং ওয়াক, দুপুর সন্ধ্যের রেডিও ছাড়া সংগীবলতে থাকে টমি কুকুরটা। বড়জোর চাকর রঘুয়া। নইলে দিনতো গুণছেন অনেক রায়গিন্নী একটি দুষ্টু হাসিমাখা ফুটফুটে ছেলের দৌরাত্ম্যে সারাটা দিনের নিঃসঙ্গতাকে মুছে দিতে। হেসে খেলে আদরে আব্দারে জীবনের শূন্যতাকে ভরাট করবার অনন্ত আকাঙ্ক্ষায় কত কতদিন ধরে তুলেছেন মনের কোণে স্বপ্নের ঝড়। কিন্তু হলো কই। দিন গড়ালো রাত পালালো সময় বুড়িয়ে গেলো ক্যালেণ্ডারের কালো অক্ষরের বাঁকা হাসির ফাঁক দিয়ে। তবু আসলো না কেউ।

তাই সকাল-বিকাল ঘন ঘন ডাক পড়ে পাঁচির। বারবার চাকর পাঠান এপারে রায়গিন্নীরা। নানান কথার কাকলীতে তবুও ডুবে থাকা যায়। থাকা যায় সময়ের নিষ্ঠুর শাসনকে এড়িয়ে দুদণ্ড স্বস্তিতে। স্নেহ করেন, মোটামুটি ভালও-বাসেন তিনি পাঁচিকে। মাঝেমধ্যে ভালোমন্দটা খাওয়ান, এটা সেটা দিয়ে সাহায্য করেন তিনি পাঁচিকে। নইলে বনের পাখী শিকলে বাঁধা পড়বে কেন? রোদগলানো তেতেওঠা দুপুরের হাসফাসানির সময় কে আসবে তার কাছে? কে ঘুরে বেড়াবে আলো আঁধারী পড়ন্ত বিকেলের পাণ্ডুর ছাদে তার সঙ্গে, কে ঘুচিয়ে দেবে তার নির্বিকার নিঃসঙ্গতার জ্বালা।

এই পাঁচিকে কম চোখটাটানি সহ্য করতে হয় নি। উঠতে বসতে সব সময়েই বস্তির লোকগুলো লেগে আছে তার পেছনে। একটা খুৎ পেলেই হলো। ঘরে বসে ফিসফিসিয়ে কোচলামি করবে। আর সুযোগ পেলেই ঠোনা দিয়ে দু'কথা শুনিয়ে দিতেও কসুর করবে না। কখন কবে কোথায় কেন কিভাবে কোন্ কথাটি সে বলেছে রায়গিন্নীকে সব ওৎ পেতে শুনবে ওরা। আর তাই নিয়েই না রসিয়ে রসিয়ে কত কথা কত মস্করা ফষ্টিনষ্টি।

তাইতো ভালো লাগেনা পাঁচির এপারকে। দু'চোখে দেখতে পারেনা বস্তির লোকগুলোকে। তাইতো সময় পেলেই চলে যায় ওপার, ওই ছিমছাম দোতালা দালানবাড়ীতে। ওখানেই তার যত শান্তি যত স্বস্তি। সবচেয়ে

বেশী পেছনে লাগে বিনোদ ফিরিওয়ালার ঝগড়াটে বউ মোক্ষদা আর তার ধুমসী বেজাহানি মেয়ে ক্ষান্তমণি। এতটুকু খুৎ পেলো কি ব্যস। সাতঘাটের জল একঘাটে করবে। শুনিয়ে দেবে সাতসতেরো। নইলে নিজের ঘরকুণো বাপকে কিছু বল্লেই ওরা অমন ধা-ধা করে ছুটে আসে কেন? বুড়োর জন্যে যদি তোদের এতই দরদ তবে খাওয়া দুবেলা। সে বেলা সবার মুরোদ জানা আছে। আসল কথা একটা ছুতো খুঁজে তাকে কিছু বলা।

এই তো সেদিন যা-না তাই বলে গেল মোক্ষদা। দোষের মধ্যে ভুল করে ওদের দাওয়ায় এঁটোকাটাগুলো রেখেছিলো পাঁচি। তার জন্যে এত ঠেস মেরে কথা বলা কেন? রায়গিন্নীর সঙ্গে তার মিলমিশ, তাতে ওদের কি। হিংসে। হিংসের জ্বলেপুড়ে মরছে মা-বেটি। সবাইকে জানে পাঁচি। নইলে কেঁচোর গর্ত খুড়লে কি সাপ পাওয়া যায় না এক-আধটা।

বলুক ওরা যতখুশি। তবু সে যাবেই। একশ, হাজারবার। তাকে যেতেই হবে ওখানে।

দুপুরের দিকে ওপারে গেল পাঁচি। রায়গিন্নী সবে পায়ের উপর পা ছড়িয়ে একরাশ ভিজে চুল ছড়িয়ে দিয়েছেন পিঠের ওপর। বৈদ্যুতিক পাখার ঝুরঝুরে হাওয়ার ছাটে আলগা অলসতায় শরীরটা এলিয়ে দিয়েছেন সবে ডেক চেয়ারে। পাঁচিকে দেখে নড়েচড়ে বসে বল্লেন: আয়, বোস এখানে।—

হেলেদুলে ঘরে ঢুকে সটান মেঝের ওপর বসে পড়লো পাঁচি। ডেকচেয়ারের পিঠ ঘেঁসে রায়গিন্নীর একগোছা চুল হাওয়ায় দুলছিল। পাঁচি ডান হাতের আঙুল কটা দিয়ে সেগুলিকে নাড়তে নাড়তে কত কথাই না বল্লে। বস্তির লোক-গুলো সব বদের হাঁড়ি! ওদের মুখ থেকে রায়গিন্নীর দুর্নামের কথা শেষ হতে চায় না। আর যত দল পাকানোর গোড়া ওই ফিরিওয়ালা বউ মোক্ষদা আর তার আইবুড়ো মেয়েটা। রায়গিন্নী সায় দিলেন না পাঁচির কথায়। শুধু ঠোঁটের কোণে ছড়ালেন এক টুকরো দুর্বোধ্য হাসির রেশ। আয়ত চোখ দুটো একটা অবজ্ঞা আর বিতৃষ্ণার জ্বালায় জ্বলে উঠলো ক্ষণিকের জন্যে।

সেদিন বিকেলের দিকে এপারে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল। মোক্ষদা হাত পা ছুঁড়ে গলা ফাটিয়ে পাড়া মাতালো। যোগানদার ক্ষান্তমণিও কম গেলনা। মারমুখো পাঁচি চিঁ চিঁ করলো অনেকক্ষণ ধরে। শেষটায় রায়গিন্নী আসলেন। রঙদার চটিজোড়া ঘসতে ঘসতে উঠানের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন: পাঁচি চলে আয় এদিকে। এতক্ষণে বুকে বল আসলো পাঁচির। হাতের ঝাঁটাটা সজোরে মাটিতে ছুঁড়ে হন হন করে সে ছুটে আসলো রায়গিন্নীর কাছে।

পাঁচি কি বলতে যাচ্ছিল। থামিয়ে দিলেন রায়গিন্নী। বাঁ হাতের সরু সরু আঙুলগুলো দিয়ে জর্জেটের দামী শাড়িটা একটু উঁচিয়ে ধরলেন। একরাশ বিরক্তি আর অবজ্ঞার ঢেউ ছড়ালেন তুলতুলে গালের কোণে। মিনমিনিয়ে উঠলো পাঁচি : চোর, চোর ওই বেটি।—হাত উঁচিয়ে ক্ষান্তমণিকে নির্দেশ করে বল্লে : আপনার দেওয়া অত সাধের ছাপার শাড়ীটা চুরি করেছে হারামজাদী। বলতে গেছি, অমনি ঝেঁটিয়ে এসেছে ম.-বেটি। ফিক করে একটু হেসে নিলেন রায়গিন্নী, বল্লেন আঃ, থামনা মুখপুড়ি। কিন্তু কে কার কথা শোনে। পাঁচির মুখ না, যেন ফোটা খই। কেন, অত ভয়টা কিসের। চুরি করবে আবার বড় গলা। মুখ ছেঁচে দেবো না।—এবার তেড়ে আসলো মোক্ষদা। চিৎকারে ফেটে পড়লো : ত্থাখ ভাল হবে না বলচি পাঁচি। বড় মানুষের সাথে খাতির করে গায়ে জোর বেড়েচে, না ? বেশী কথা বলবি তো খুন করে ফেলব বলছি। —ক্ষান্তমণি পেছন থেকে ফোড়ং কাটলো : উঃ, আমার বড়লোক রে। অমন টাকা-ওয়ালা লোক ঢের দেখেছি।—প্রসঙ্গ গড়াত অনেক দূর। কিন্তু মাঝপথে থামিয়ে দিলেন রায়গিন্নী। কটমট করে তাকালেন একবার ক্ষান্তমণির দিকে। একটা দুর্বোধ্য আগুনদৃষ্টি ছুঁড়েদিলেন ওদের দিকে। তারপর শক্ত করে ধরলেন পাঁচির হাতটা। জোর করে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন ওপারে, ওই গোলাপী রঙের ছিমছাম দোতলা দালান বাড়ীতে।

সারাটা দিন মাটি করে দিলো এই অলক্ষুণে বৃষ্টি। ঘর-উঠান কাদায় থৈ থৈ। চোঙখোলা চুঁইয়ে জল গড়াচ্ছে অঝোরে। ভাঙা পলেস্তরা দিয়ে তাকে আটকে রাখা দুষ্কর। এদিকে ঘরে নেই চাল, নেই ঘুঁটে। কাজকাম ছেড়ে ঘর জুড়ে বসে থাকলে পেট ভরবে শুনি। বুড়ো বাপ রামতারনের ওপর পুরোদস্তুর ঘেন্না ধরেগেছে পাঁচির। আজ পুরো দুটো দিন একরকম হরিবাসর চল্লো। পেটে গামছা বেঁধে পড়ে থাকার চেয়ে দু'একটা খাট চেয়ার বানালেও তো হ'ত। কিছু বলা চলবে না বাপকে। অমনি ঝেঁটিয়ে আসবে। শেষ পর্যন্ত উপায়হীন হয়ে হাত পাততে হলো মোক্ষদার কাছে। দুটি চালের জন্যে। মোক্ষদা খানকিটাক চাল দিয়ে পাঁচিকে বল্লো : না বাপু ঘরের লোক তোমরা। কাল থেকে বুড়োটা না খেয়ে আছে, একটি বার জানালেও তো পারতে।—কষ্টকরে একগাল শুকনো হাসি হাসলো পাঁচি। বল্লো : আবার রাতবিরেতে জ্বালাতন।—গলগলিয়ে উঠলো

মোক্ষদা : রাত হয়েছেলো তা' তে কি। পাশাপাশি ঘর বৈত' নয়। ফুঁ দিলে শব্দ কানে আসে। কথা বল্লোনা পাঁচি। চাল ক'টা নিয়ে দাওয়ার কাছে আসতেই কে যেন চাবুক মারলো তাকে। ওঘর থেকে শোনা গেল ক্ষান্তমণির চাপা গলার আওয়াজ : এই না কত গা মাথামাখি রায়গিন্নীর সঙ্গে। আমরা কে, আমরা তো শত্তুর। দুচোখের বিষ। এবার হাত পাততে লজ্জা করলো না মুখপুড়ির।—দাঁড়িয়ে গেল পাঁচি। কান দুটো খাড়া করে ওদের কথা শুনবার চেষ্টা করলো। শোনা গেল মোক্ষদার ফিসফিসানি : আঃ, থামনা। কাল থেকে বুড়োটা না খেয়ে ঢলাঢল হয়ে পড়ে আছে।—ছাইচাপা আগুন জ্বলে উঠল দপ করে। সোজা হয়ে দাঁড়ালো পাঁচি। বুকের ভেতরে একটা বিক্ষোভের আলোড়ন খেলে গেল। অনেক কষ্টে শেষপর্যন্ত দাঁতে দাঁতে চাপল সে। অবাধ্য মুখটাকে শাসন করল কোন মতে।

বৃষ্টি একটু ধরলেই ওপারে গেল। রায়গিন্নী উৎসাহের সঙ্গে পাঁচিকে টেনে নিয়ে গেলেন ঘরে। কৌটো খুলে যত্ন করে একটা পান দিলেন তার হাতে। দামী কৌচে বসালেন তাকে জোর করে। নিজে বসলেন পাশে ঘন হয়ে। বুলবুলিয়ে উঠলেন : হ্যাঁরে, তোদের ওখানে নাকি কি সব হচ্ছে আজকাল।—আগের মতো সাত কথায় ঢলে পড়বার মতো উৎসাহ নেই আজকাল পাঁচির। বস্তির লোকগুলোকে নিয়ে রংমস্করা করবার ইচ্ছে নেই তার পারত পক্ষে। কোন রকমে রয়েসয়ে দিন কাটাবার পক্ষপাতি সে। তাই ছাড়া ছাড়া জবাব দিল, কই জানি না তো কিছু। রায়গিন্নী মুখে একঝলক গূঢ় হাসির রেশ তুললেন। বললেন : আহা ন্যাকা সাজা হচ্ছে মেয়ের। এই তো শুনলাম, রাতের দিকে তোদের ওখানে নাকি সব নতুন নতুন লোক দেখা যায়।—এবার একটু নড়েচড়ে বসল পাঁচি। পুরোনো মেজাজটা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। শেষে হঠাৎ বলেই ফেলল, যায় না তো কি। ওই যে ক্ষান্তমণি, বিনোদ ফিরিওয়ালার মেয়ে, ওর কাছেই তো।—রায়গিন্নী সচল হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন পাঁচির দিকে—কখন রে ?

পাঁচি নিরুত্তাপ গলায় বলল, সে প্রায় মাঝ রাতে। লোকজন এলে বাপ-বেটা আর মা ঘর ছেড়ে দাওয়ায় গিয়ে শোয়। আর ও'দিকে ক্ষান্তমণি আর তার মক্কেলটি ঘরে ঢুকে—

আজকাল এসব আলোচনা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে পাঁচি।

তাই প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘোরাবার জন্য ফের সে বলে ওঠে : তাইত বলি, করিস তো ফিরির কাজ। নিত্যিনতুন মেয়ের এসব শাড়ি-গয়না আসে কোত্থেকে ?

রায়গিন্নী পাঁচির কথা শুনে যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। ইপ্সিত জন্তু খুঁজে পাওয়ায় আনন্দে শিকারীর চোখ যেমন জ্বল জ্বল করে ওঠে তেমনি তাঁর চোখদুটো আচমকা ঝলসে উঠল। কি যেন, একটা খুঁজে পাবার আগ্রহ চোখের কোণে এক টুকরো কাঠিন্যের রেশ ছাড়তে লাগল বারবার।

এই প্রথম আসলেন রায়বাবু ঘোষবস্তিতে। চার চারটে খুদে কারখানার মালিক উমাশংকর রায়ের পায়ের ধুলি পড়লো এপাড়ে। সুপুষ্ট গোঁফে একবার চাড়া দিয়ে নিলেন, হাতের আইভরি-হ্যাণ্ডেল দামী ছড়িটাকে অভ্যাসমত শূন্যে ঘোরাতে লাগলেন ; জরিদার ফরাসডাঙা ধুতির খুঁট বাঁ হাতের মুঠোয় শক্ত-করে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে আসলেন বিনোদ ফিরিওয়ালার খুপরির কাছে। পেছনে আসলেন রায়গিন্নী। কাপড়ে বাহারে চলায় যেন একটি মূর্তিমান স্বপ্নিল ভঙ্গিমা। হুংকার ছাড়লেন রায়বাবু : বিনোদ আছো। মিনিট কয়েকের মধ্যে লোক জমতে দেরী হলো না। গুটি গুটি করে বেরিয়ে এল ঘোষবস্তির সবক'টি মরদ। বিনোদ, মোক্ষদা, কান্তমণি, পাঁচি, রামতারণ—সবাই। বিনোদ এগিয়ে এল সবার সামনে। তার ড্যাবডেবে ভয়ার্তচোখের তারাদুটি ক্ষণিকের জন্যে পর্যবেক্ষণ করে রায়বাবু আর রায়গিন্নীকে। ঢোক গিলে বিনোদ বল্লে, আজ্ঞে—ডাকছিলেন বাবু?

—রায়বাবু জিজ্ঞেস করলেন : তোমার নাম বিনোদ গড়াই? —বিনোদ মাথানেড়ে সম্মতি জানালো। গর্জন করে উঠলেন রায়বাবু : এসব পেয়েছ কি, মগের মুল্লুক? ফ্যালফেলিয়ে তাকালো বিনোদ। আটকা গলায় ফের বল্লো সে : আজ্ঞে—। হাতের ছড়িটাকে বারদুয়েক শূন্যে ঘুরিয়ে চিৎকারে ফেটে পড়লেন রায় বাবু : চোপরাও উল্লু। বেয়াদব কোথাকার! ন্যাকা সাজা হচ্ছে। নষ্টামির জায়গা পেয়েছো এটা।—রামতারণ সবার পেছনে ছিল, সে এগিয়ে এল। বিনীত হয়ে বল্লো : কি হয়েছে বাবু।—গোঁফে চাড়া দিয়ে বল্লেন রায়বাবু : হবে আর কি, যত রাজ্যের নোংরামি। জায়গাটাকে নরক বানিয়ে তুলেছে। তাকালেন ফের বিনোদের দিকে, বল্লেন : ফের যদি এসব শুনি তো পিটিয়ে বস্তি থেকে তুলে দেবো। এবার রায়গিন্নী কথা বল্লেন। এত দিনের সঞ্চিত অবজ্ঞা আর বিতৃষ্ণা প্রথমবারের মতো সবাক বিদ্রোহ করলো, বল্লেন তিনি বিনোদকে : পয়লা নম্বরের চোর তোমার বউ। মেয়েটাকে দিয়ে ব্যবসা করাও, লজ্জা করেনা তোমার!

—বিনোদ কাঁপছিল এতক্ষণ ঠক ঠক করে। আচমকা সে ঝাঁপিয়ে পড়লো রায়বাবুর পায়ের কাছে। কাঁদো কাঁদো গলায় বল্লো সে, বারবার আর হবে না বাবু।—পাঁচি দাঁড়িয়ে ছিল ভীড়ের এক কোণে। দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে শুনছিলো সবকিছু। এবার একটু একটু করে তার সারা মুখে একটা কঠিনতার আস্তরণ পড়তে লাগলো। কি যেন বলবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠল বারবার। ভাল করে সে ঠারিয়ে নিল রায়গিন্নীকে। তারপর কখন অদৃশ্য হলো খুপরির ভিতর।

সে রাত্রে ঘুম হ'লোনা পাঁচির।

সারা রাত কিল চড় লাথির দুমদাম শব্দে শিউরে উঠল সে বারবার। বুড়ী মোক্ষদাকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি বিনোদ। ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মেরেছে ক্ষান্তমণিকে। থেকে থেকে গুমরে ওঠা পাশব আর্তনাদে আঁৎকে উঠেছে পাঁচি বারবার।

ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠল পাঁচি। রাতের একগাদা এঁটোকাঁটা নিয়ে বসলো উঠানে, মাজবার জন্যে। ডাগর চোখদুটোতে একটা অসোয়াস্তির দপদপানি। মোক্ষদা সবে উনুনে আঁচ দিচ্ছিলো। আড়চোখে ঠারিয়ে নিল তাকে। মোক্ষদার মুখটা ফোলা ফোলা দেখাচ্ছিল। বিস্রস্ত রুক্ষ চুলের গোছা লেপ্টে পড়েছে সারা কপালময়। ক্ষান্তমণি একটু দূরে নিঃশব্দে গুল দিতে বসেছে। হাঁটুর মধ্যে মাথা ডুবিয়ে একমনে কাজ করে চলেছে সে। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল পাঁচির। চোখ-দুটো ছলছল করে উঠল মুহূর্তের জন্যে। ওপারে রায়বাবুর আনকোরা গাড়ীটা এসে থামল এইমাত্র। রায়গিন্নী ফিরলেন মর্নিং ওয়াক সেরে। দরজা খুলে লনের উপর নেমে আসলেন তিনি। সঙ্গে নামল বিলাতি স্বাস্থ্যবান কুকুরটা। রুমাল দিয়ে আলতো করে কপাল মুছতে মুছতে পরণের ধনেখালি শাড়ীটা গুছিয়ে নিলেন। রঙদার চটিজোড়া ঘসে নিলেন লনের বেড়ে ওঠা ঘাসের ওপর। তারপর ইশারা করে ডাকলেন এপারের পাঁচিকে। পাঁচি মুচকে হাসলো। এঁটো হাতেই উঠে দাঁড়ালো সে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলো ওপারের দিকে। হঠাৎ কি ভেবে থমকে দাঁড়ালো উঠানের মাঝখানটায়। রায়গিন্নী ওপার থেকে বল্লেম: শুনে যা পাঁচি।—কিন্তু আশ্চর্য পাঁচি নড়লো না একপাও। ভাল করে একবার দেখে নিল রায়গিন্নীকে। তারপর গলার দু'পাশের রগদুটোকে ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: যাব না। আমি কি আপনার কেনা চাকর যে ডাকলেই ছুটতে হবে।—আর দাঁড়াল না পাঁচি। হনহন করে ছুটে আসলো এপারে।

চোঙ খোলার খুপরিগুলোর কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লো: মোক্ষদাকে চোর বলবার আপনি কে। ক্ষান্তমণি ব্যবসা করে তাতে আপনার কি ?— রায়গিন্নী ধাতস্থ হয়ে নিলেন। তারপর চোখের কোনায় অবজ্ঞা আর কাঠিন্যের আগুন ঝরিয়ে তরতর করে উঠে গেলেন ওপারের ওই দোতলা দালান বাড়ীতে। পাঁচি ভেংচি কেটে চেঁচিয়ে উঠল': উঃ, আমার বড়লোক রে!

ওপারের বারান্দায় দুলছে সারি সারি অর্কিডের টব। ভোরের রোদ্দুরে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে কার্নিশ বেয়ে ওঠা মনিং লোরি 'গার ঝুমকো লতা। শিশু গাছের সরু সরু পাতায় রেডিও'র মিঠে গুঞ্জন ছড়াচ্ছে সিম্ফনি।

এপারে চোঙ খোলার ঘর বেয়ে উর্ধ্বায়িত ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে এঁকে-বেঁকে। হাস-মুরগার খোঁয়াড়ের মতো চার দড়মার আগল-ঘেরা খুপরি ঘরগুলো এখন হৈ হুল্লোড়ে সরগর।

এপারে ঘোষ বস্তি। ওপারে রায়বাড়ী।

———